বৈতরণী-তীরে

"বনফুল"

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৪৩

দ্বিতীয় সংস্করণ—কার্ত্তিক ১৩৫১

পুনর্মুদ্রণ—বৈশাখ ১৩৫৩

মূল্য দুই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস

২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১১—২৫. ৪. ৪৬

উৎসর্গ

পূজনীয়
পিতৃদেবের শ্রীচরণে

ইহা শুধু ভূতের গল্প নহে—বর্ত্তমানেরও গল্প এবং খুব সম্ভব ভবিষ্যতেরও।

ভাগলপুর
১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩

"বনফুল"

মড়া কথা কহিতেছে।

বই হাতে করিয়া একা জাগিয়া আছি। আশেপাশে মড়া ঘুরিতেছে।···কিছুতেই ঘুমাইতে পারি না। আমি নিজে ডাক্তার, ঘুমের কোন ঔষধ বাকি রাখি নাই। নরম বিছানা শক্ত বিছানা নানা রকম করিয়া দেখিয়াছি, কিছুতেই কিছু হয় না। ঘর অন্ধকার করিয়া রাখিলেও যাহা ফল, আলো জ্বালিয়া রাখিলেও তাহাই। আলোর রঙ বদলাইয়াও দেখিয়াছি, পয়সা খরচ হয় মাত্র, ঘুম হয় না। চোখ বুজিয়া কতদিন এক হইতে এক হাজার পর্য্যন্ত গণনা করিয়াছি, কল্পনা করিয়াছি, পাহাড় বাহিয়া মেষের পাল নামিতেছে—এক, দুই, তিন, চার···দশ··· বিশ···শত···সহস্র। ঘুম আসে না। কিছুতেই ঘুমাইতে পারি না।

অন্ধকার দুর্য্যোগের রাত্রে বই হাতে করিয়া জাগিয়া আছি। আশেপাশে মড়া ঘুরিতেছে। ইহাদের এককালে আমি চিনিতাম, প্রত্যেককে আমি চিরিয়াছি। সরকারী চাকুরির দৈনন্দিন কর্ত্তব্য; রোজ মড়া চিরিতে হয়। অনেক চিরিয়াছি। তাহাদেরই কয়েকজন আজ আমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, কথা কহিতেছে। সকলেই নিজের কাহিনী শুনাইতে ব্যগ্র।

"তুমি তো জান, আমি আফিং খেয়ে মরেছিলাম। আমার পেট চিরে সে খবর তুমি বার করেছিলে—ছুরি দিয়ে চিরে। উঃ, কি ধারালো তোমাদের ছুরিগুলো—কি চকচকে! কিন্তু একটা খবর তুমি পাও নি ডাক্তারবাবু। আফিং খাওয়ার আগেই আমি মরেছিলাম। সে খবর আমার পেটে ছিল না—মনে ছিল। মনকে তো আর ছুরি দিয়ে চেরা যায় না। যতই ধারালো হোক না কেন তোমাদের ছুরি।"

একটি উদ্ভিন্নযৌবনা ষোড়শী সুন্দরী। মুখখানি এখনও কোমল। অমন সুন্দর ধপধপে গায়ের রঙ অহিফেনের বিষে নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। মনে হইতেছে, যেন একটি অৰ্দ্ধবিকশিত নীলপদ্ম। একটু থামিয়া মেয়েটি আবার বলিতে লাগিল—"হ্যাঁ, আমি আগেই মরেছিলাম। মৃত্যু কত রকম হয় জান? তোমরা তো মরণ নিয়ে দিনরাত কারবার কর? আত্মা অমর ব'লে জান তো? সেটা মিছে কথা। আত্মাও মরে। তোমাদের চারপাশে কত যে জীবন্ত শব রোজ ঘুরে বেড়ায়, তা যদি টের পেতে! কেউ হয়তো তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, কেউ হয়তো পিতা, কেউ স্ত্রী। অনেকের আত্মা ম'রে যায়, তোমরা বুঝতে পার না। তাদের মৃত আত্মার দুর্গন্ধ তাদের কথায় ব্যবহারে চিন্তায় সকলকে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে, তবু তোমরা বুঝতে পার না যে, তারা মড়া। তবু তাদের তোমরা পুড়িয়ে ফেল না। আমারও আত্মা ম'রে গিয়েছিল।"

বলিয়া একটু হাসিয়া মেয়েটি বলিল—"তুমি ভাবছ, প্রেমের

গল্প শুরু হ'ল এবার। প্রেমের নয়—মৃত্যুর। সে প্রণয়ী নয়, যম। কিন্তু কি মনোহর সে! তার দোষ ছিল না তত। আমিই তাকে ফাঁদ পেতে ধরেছিলাম। নিজের মৃত্যুকে নিজে ডেকে এনেছিলাম। সাপুড়ে যেমন সাপকে নিয়ে খেলা করে, আমিও ঠিক তাকে তেমনই খেলিয়েছি। আমার বাঁশীর তানে মুগ্ধ হয়ে সেই চিক্কণ চিত্রিত বিষধর কত খেলাই না খেলেছে ফণা বিস্তার ক'রে! নিজের কৃতিত্বে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যেতাম। কিন্তু একদিন সে দংশন করলে—করাল সে দংশন। মারা গেলাম।" বলিয়া সে চুপ করিল।

আমার টেবিল-ল্যাম্পটাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ছোট বড় নানা রঙের পোকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ একটা বড় রঙিন ফড়িং আসিয়া ডানা ঝটপট করিয়া বাতিটার কাচের উপর আছড়াইয়া পড়িল। দুইজনে নীরবে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম।

আবার সে ধীরে ধীরে বলিল—"আমার সে মৃত্যুর খবর তুমি পাও নি ডাক্তারবাবু। সে শোচনীয় মৃত্যু। জননী হয়ে সন্তানহত্যা। হেসো না। আমি একা হত্যা করি নি। সমাজ শিশুটার পা ধরেছিল, শাস্ত্র হাত ধরেছিল, আমি তার টুঁটি চেপে ধরেছিলাম। রুদ্ধ আর্ত্তনাদ ক'রে সে ম'রে গেল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমিও ম'রে গেলাম। আমার আত্মা, আমার ইহলোক, পরলোক সমস্ত একসঙ্গে ম'রে গেল—শোচনীয় সে

মৃত্যু। সমাজ কিন্তু এখনও মরে নি, শাস্ত্র এখনও বেঁচে আছে আমার এ মৃত্যুর খবর তুমি জানতে ?”

“না

“আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে তোমার ?”

“আমি কিছু বিশ্বাস করি না।”

“বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা ?”

“না।”

মেয়েটি উৎসুক নয়নে আমার দিকে চাহিয়া আছে। দৃষ্টি হইতে একটা অব্যক্ত বেদনা ঝরিয়া পড়িতেছে। মিনতি করিয়া সে আবার বলিল—“আমি মিছে কথা বলি নি ডাক্তারবাবু। বেঁচে থাকতে অনেক মিছে কথা বলেছিলাম, এখন যা বলছি সব সত্যি। আফিং খেয়ে মরেছে আমার দেহটা, আমি মরেছি তার পূর্ব্বে। আমার সে শব-জীবন ব'য়ে বেড়াতে পারলাম না। আফিং খেয়েছিলাম বাঁচবার আশায়। আমি আবার বাঁচতে চাই—সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়ে বাঁচতে চাই—বিশ্বাস কর—”

তাহাকে থামাইয়া দিয়া একটি যুবক আগাইয়া আসিল। তাহার মাথার খুলিটা ফাটিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে। একটা ফাটল দিয়া খানিকটা মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মুখময় খোঁচা-খোঁচা গোঁফ-দাড়ি—যেন কয়েক দিন কামানো হয় নাই।

যুবকটি বলিতে লাগিল—“দেখ, পৃথিবীর মানুষের কাছে দুঃখের কথা জানানো বৃথা। তা কি আজও বোঝ নি ? এরা যতক্ষণ বেঁচে আছে, ততক্ষণ স্বার্থের কথা ছাড়া কিছু বোঝে না—

বুঝতে পারে না। ওরা এক রকম সোনাই চেনে, স্বার্থের কষ্টিপাথরে যার দাগ পড়ে। পৃথিবীর বাকি সব জিনিস ওদের কাছে বাজে।”

বলিয়া লোকটি আগাইয়া আসিয়া আমার টেবিল-ল্যাম্পটার কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া পোকাগুলা দেখিতে লাগিল। বিচিত্রবর্ণ ফড়িংটার দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া সে হাসিয়া বলিল—“যখন বেঁচে ছিলাম, এদের নিয়ে কবিতা লিখেছি। কত রকম উপমাই যে দিয়েছিলাম! নারী যেন আলোকের শিখা, পুরুষ যেন পতঙ্গ। পতঙ্গ আলোকশিখার মোহে তাতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ভারি মুখরোচক সব উপমা!” লোকটি আবার খানিকক্ষণ সেই আলোক-লুব্ধ পতঙ্গটির দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর সেই মেয়েটির দিকে চাহিয়া বলিল—“পৃথিবীর মানুষ স্বার্থের কথা ছাড়া কিছু বোঝে না। নিঃস্বার্থভাবে তারা যা করে, তার মধ্যেও স্বার্থ আছে—আত্মতৃপ্তি। আমি ছিলাম কবি। কারও কোন অনিষ্ট করি নি। নিজের মনে নিজের কোণে থাকতাম। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে খুব কমই আমার সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু সবাই আমাকে এমন ভুল বুঝতে শুরু করলে যে, স’রে পড়তে বাধ্য হলাম। আমার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলে ঠিক করেছিল, আমি পাগল। ছন্দের পর ছন্দ গেঁথে যার বন্দনা করলাম, সে সুদ্ধ আমাকে ভুল বুঝলে, সে সুদ্ধ আমাকে—” বলিয়া ছোকরা হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাসিতে হাসিতেই বলিতে লাগিল—"এখন শুনেছি, সে নাকি অনুতাপ করে। শুনেছি, আমার মৃত্যুর পর সেও নাকি মরেছে। কোথা গেছে খুঁজে পাই না। এখানে যাদের দেখি, সবাই অচেনা। যদি দেখতে পাও তাকে, ডেকে দিও তো আমার কাছে।"

মেয়েটি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি তাকে ভালবাসতেন?" কবি কোন উত্তর দিল না। তাহার সমস্ত মুখখানা সহসা রক্তবর্ণ হইয়া আবার কেমন ফ্যাকাশে হইয়া গেল। মাথার ফাটলটা দিয়া আরও খানিকটা মস্তিষ্ক গলগল করিয়া বাহির হইয়া আসিল। কোন কথা সে বলিল না।

মেয়েটি বলিল—"উত্তর দিচ্ছেন না যে?"

"ও কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না। 'ভালবাসতাম' এই কথাটা এত সস্তা, এত বেশি রকম খেলো হয়ে গেছে যে, ওটা ব্যবহার করতে আমার লজ্জা হয়। মনে হয়, তাকে অপমান করা হবে। মনে আছে, একবার একটা কবিতায় লিখেছিলাম—

আমার মনের রঙিন কথাটি
মনের ভিতরে আছে,
তাহারে মূরতি দিবে বলি মোরে
কবিতা আসিয়া যাচে।
এত রঙ তার আছে কি ভাষায়?
ভয় হয় মোর খালি,
কলমের মুখে লিখিতে গিয়া সে
লাগাইয়া দিবে কালি।"

মেয়েটি আবার প্রশ্ন করিল—"কেমন দেখতে সে ?"

"দেখতে ? কালো রঙ। এক পিঠ চুল। বড় বড় চোখ। মুখে তার হাসি লেগেই আছে। ঠোঁটে যখন হাসি থাকে না, চোখ দুটি হাসে। আশ্চর্য্য তার হাসি ! আমি যেদিন রাত্রে রিভল্‌ভার দিয়ে মাথার খুলিটা উড়িয়ে দিলাম, শুনেছি, ঠিক তার পরদিনই সেও পুড়ে মরেছে—গায়ে কেরোসিন তেল লাগিয়ে। কেন সে মরতে গেল ? তার অমন স্বামী, অমন সংসার। তার যদি দেখা পাও—এ কি, কোথা গেলে ?"

সন্তান-হত্যাকারিণী নিঃশব্দে কখন মিলাইয়া গিয়াছিল, কবি জানিতেও পারে নাই। সে তখন আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—"দেখুন, তাকে যদি কখনও দেখতে পান, আমার কথা বলবেন। বলবেন, আমি তাকে খুঁজছি। বলবেন, সেদিন রাত্রে তো কিছুই বলা হয় নি, দেখা পেলে এখন বলব। সে আমাকে ভুল বুঝেছিল—তার ভুলটা ভেঙে দিতে চাই।"

বলিয়া যুবক বাহিরে চলিয়া গেল।

নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি।

আশেপাশে কাছে দূরে শবেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

হঠাৎ কে যেন কথা কহিয়া উঠিল।

দেখিলাম, বিচিত্রবর্ণ সেই প্রজাপতিটি বলিতেছে—

"হে মনুষ্যনির্ম্মিত বর্ত্তিকা, তোমাকে দেখিয়া আমার করুণা হইতেছে। হে আলোকশিখা, হে বন্দিনী, তোমার দুর্দ্দশা দেখিয়া অনুকম্পায় আমার সমস্ত অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইয়া

উঠিয়াছে। মানবের হস্তে ক্ষুদ্র ক্রীড়নক তুমি, বিধাতার অভিপ্রেত এই বিপুল অন্ধকারকে বিদূরিত করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরিতেছ। অন্ধকারকে তুমি আলোকিত করিতে পার না—শুধু তাহার স্নিগ্ধতাটুকু নষ্ট করিয়াছ। তোমার এই অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্ব যে কতদূর হাস্যকর, তাহা তুমি নিজেও বুঝিতে পার না। তোমাকে দেখিয়া আমার দয়া হইতেছে।”

কম্পিত আলোকশিখা তাহাকে সভয়ে প্রশ্ন করিল—“কে তুমি?”

“আমি? আমি আলোকের উপাসক। সুদূর আকাশচারী প্রদীপ্ত সূর্য্য আমার উপাস্য দেবতা। আমার এই বহুবর্ণ-বিচিত্রিত পক্ষ দুইটিতে ভর করিয়া প্রতিদিন তাঁহারই উদ্দেশ্যে আকাশযাত্রা করি। কিন্তু বেশি দূর যাইতে পারি না, দুর্ব্বল পক্ষ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। পৃথিবীর টানে আবার মাটিতে নামিয়া আসি। দিবাকর অস্তাচলগামী হয়—অন্ধকার আসিয়া পৃথিবী ছাইয়া ফেলে। অন্ধকারের গভীর নিবিড়তায় আমি সেই মহাজ্যোতিষ্মান সূর্য্যেরই ধ্যান করিতেছিলাম। তুমি আমার তপোভঙ্গ করিয়াছ। তোমাকে আমি অভিশাপ দিতাম, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমার করুণা হইতেছে। হে নকল জ্যোতিষ্ক, হে ছদ্মবেশী অহঙ্কার, হে কালিমাবিতরণকারী কেরোসিন-শিখা, দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তুমি নির্ব্বাপিত হও।”

আলোকশিখা কাঁপিতে লাগিল।

"আইন বিশ্বাস কর ?"

একটি ছিপছিপে পাতলা যুবক আসিয়া আমাকে প্রশ্ন করিল। খড়্গের মত তাহার নাকটা। শীর্ণ মুখের কোটরগত চক্ষু তুইটিতে অস্বাভাবিক তীব্রতা। তাহা জ্যোতি নয়—জ্বালা। মাথার সম্মুখ দিকটা কেশবিরল। বাকি চুলগুলি দীর্ঘ—অবিন্যস্ত। কানের কাছের তুই গোছা চুল ললাট ও কপোলের খানিকটা অংশ ঢাকিয়া দিয়াছে। মনে হইতেছে, যেন তুই টুকরা অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। শীর্ণ সুচালো চিবুকের উপর তুই-চারিগাছা রোম উদগ্র হইয়া রহিয়াছে। ঠোঁট তুইটি কাঁপিতেছে।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আবার প্রশ্ন করিল—"আইন বিশ্বাস কর ? আইন ? যার জন্যে এত আদালত, এত জজ, এত কেতাব, এত উকিল—এত সব ? যে আইনকে সাহায্য করবার জন্যে তুমি দিবারাত্রি ছুরি হাতে ক'রে ব'সে আছ ? বিশ্বাস কর সেই আইনে ?" তাহার চোখ তুইটি জ্বলিয়া উঠিল—চাহিয়া দেখিলাম, যেন তুইটি জ্বলন্ত অঙ্গার। তাহার নাসারন্ধ্র হইতে উষ্ণ বাষ্প বাহির হইতেছে। মুখখানা সে আমার আরও কাছে লইয়া আসিয়া একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার তপ্ত নিশ্বাস যেন আমার মুখে লাগিতে লাগিল। অধর তুইটি সহসা কাঁপিয়া উঠিল—"বিশ্বাস কর আইনে ?"

বলিলাম—"করি বইকি। আইনে বিশ্বাস না করলে বাঁচব কি ক'রে ?" লোকটির অধর তুইটিতে এক ঝলক বিদ্যুতের মত

একটা তীক্ষ্ণধার হাসি খেলিয়া গেল। জ্বলন্ত চক্ষু দুইটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া সে বলিতে লাগিল—"ও, ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি যে এখনও বেঁচে আছ। তুমি তো করবেই। সমাজের জীবন্ত মানুষ তুমি। তুমি তো বিশ্বাস করবেই আইনে—তুমি তো বিশ্বাস করবেই—তুমি তো বিশ্বাস করবেই।" বলিয়া সে হঠাৎ চুপ করিয়া গেল। তাহার পর আবার আপন মনেই যেন বলিতে শুরু করিল—"যতক্ষণ ভাঁড়ার-ঘর আছে, ততক্ষণ ইঁদুর ধরবার জন্যে কল তো পাততেই হবে। কচাকচ সেই কলে রোজ ইঁদুর পড়বেই। ইঁদুরের বিচার করবার অবসর জীবন্ত মানুষের থাকতে পারে না। 'স্ট্রাগ্‌ল্ ফর একৃজিস্‌টেন্স্'—সুন্দর কথাটা বার করেছ তোমরা। ওই এক মন্ত্র আউড়ে লক্ষ কোটি বলি হচ্ছে। আইন তোমরা তো বিশ্বাস করবেই। আমিও যখন বেঁচে ছিলাম, অনেক মামলা করেছি। প্রগাঢ় ভক্তি ছিল আইনের ওপর। অনেক উকিলের অনেক পকেট আমার টাকায় ভর্ত্তি হয়েছে। সে কি সোজা ভক্তি? বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সবাই বলছে—'পারবে না, হেরে যাবে, ছেড়ে দাও।' আমি কি সহজে ছাড়ি? আইন-আদালতের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি তখন আমার। ভক্তির পুরস্কারও পেয়ে গেলাম। দেশসুদ্ধ লোকের সামনে সেদিন আইনত প্রমাণ হয়ে গেল, আমার স্ত্রী সতী আর নির্ম্মল একজন সচ্চরিত্র যুবক। 'অনারেব্‌লি অ্যাকুইটেড'। আইন! এখন আর আইনে বিশ্বাস করি না, টাকায় বিশ্বাস করি। নির্ম্মল ছোকরার অনেক টাকা ছিল।"

লোকটি সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমি একা বসিয়া রহিলাম। যে বইটি পড়িতেছিলাম, তাহাই আবার তুলিয়া পড়িতে শুরু করিলাম। ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডের গল্প। একটি বিদেশী যুবককে একটি ল্যাপ-যুবতী পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে। যুবকটি বলিতেছে—

"মেয়েটি আমার আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কি সুন্দর তার চেহারা আর কি অপূর্ব্ব তার বেশ! বল্‌গা-হরিণের চামড়া দিয়ে তৈরি তার অঙ্গচ্ছদ, মাথায় লাল উলের টুপি। কোমরে চামড়ার চওড়া বেল্ট্‌। বেল্টে হলুদ আর নীল সুতোর কাজ করা, বেল্টের গায়ে খাঁটি রূপোর বড় বড় ডুমো ডুমো বোতাম—কোনটা চৌকোনা, কোনটা গোল। বেল্টে ঝুলছে একখানা ছোরা, তামাকের একটা থলি আর জল খাবার একটা মগ। গাছপালা কাটবার জন্যে একটা ছোট কুড়ুলও গোঁজা রয়েছে দেখলাম। তার পায়ের গোছ নরম সাদা বল্‌গা-হরিণের চামড়া দিয়ে ঢাকা—লেগিং বলে তাকে। পরনে হরিণের চামড়ার ব্রিচেস। গোছের লেগিং ব্রিচেসের সঙ্গে বেশ শক্ত ক'রে আঁটা। পায়েও হরিণের চামড়ার জুতো—নীল সুতো দিয়ে সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত। পিঠে তার বোচকা। বোচকাটি বার্চ-গাছের ছাল দিয়ে তৈরি, আর তাতে আছে নানাবিধ প্রয়োজনীয় জিনিস। আমার কাঁধেও একটা বোচকা ছিল; কিন্তু ও বোচকাটা ডবল ভারী।

বড় বড় ঢালু পাহাড়ের ওপর দিয়ে সে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। নিঃশব্দ তার গতি। সামনে গাছের গুঁড়ি বা ছোট পাহাড়ী নদী পড়লে অনায়াসে লাফিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। সামনে হয়তো একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড—খুব উঁচু। পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি হরিণীর নৈপুণ্যে তার ওপর লাফিয়ে উঠে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, পথ কোন্ দিকে! পাহাড় থেকে নেমে দেখলাম, একটা বেশ বড় স্রোতস্বিনী। বেশ চওড়া—লাফিয়ে পার হওয়া যাবে না। ভাবছি, কি ক'রে পার হব! দেখি, মেয়েটি নিঃশঙ্কচিত্তে জলে নেমে পড়েছে। আমিও তার অনুসরণ করলাম। সেই তুহিনশীতল বরফ-গলা ঠাণ্ডা জলে বিনা দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম—"

"ওটা কি পড়ছ?"

দেখিলাম, সেই আইন-পাগল লোকটি আবার আসিয়াছে। তাহার জ্বলন্ত চোখ দুইটা আমার মুখের উপর রাখিয়া সে বলিল—"ওসব গল্পের বই রাখ। আমার কথা শোন এখন। তখন কতদূর বলেছিলাম?"

"নির্ম্মল অনারেবলি অ্যাকুইটেড হয়ে গেল।"

"হ্যাঁ, অনারেবলি অ্যাকুইটেড। খবরের কাগজে সে কি আন্দোলন! আমার একবার ইচ্ছে হয়েছিল—কি ইচ্ছে হয়েছিল বল তো?" বলিয়া আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর আমার মনের কথাটা যেন পড়িয়া লইয়া তীব্র ব্যঙ্গহাস্যে বলিয়া উঠিল—"না না, আপীল করতে নয়,

খুন করতে। হাতে কিন্তু একটি পয়সা ছিল না। খুন করব কি ক'রে? বন্দুক না হ'লেও অন্তত পক্ষে একটা ছোরা চাই তো। হাতে এমন একটি পয়সা ছিল না যে, ছোরা কিনি। অস্ত্রের মধ্যে ঘরে ছিল একটা ভোঁতা জাঁতি আর তার চেয়েও ভোঁতা একটা বঁটি। আইনের মত তীক্ষ্ণ অস্ত্রও যার কাছে ব্যাহত হয়ে ফিরে এল, তাকে খুন করতে হ'লে খুব শানিত হাতিয়ার দরকার। অর্থাৎ খুন করতে গেলেও পয়সা চাই। নিতান্ত নিঃস্ব যে, সে কাউকে খুন করতে পারে না; বিশেষত সে যদি আমার মত দুর্ব্বল হয়।"

বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। বিশ্রী সে হাসি। মনে হইতে লাগিল, যেন চিতার আগুন দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে।

একটু পরে সে আবার বলিল—"ভেবে দেখলাম, দুর্ব্বলের মৃত্যু ছাড়া পথ নেই। মৃত্যুই তার একমাত্র বন্ধু, একমাত্র পথ। কিন্তু একটি কথা আমার বিশ্বাস কর—মরতে আমার বড় কষ্ট হয়েছে। মরবার ইচ্ছে ছিল না। আমি অপেক্ষা করেছিলাম— হ্যাঁ, তার জন্যে অনেক দিন অপেক্ষা করেছিলাম। সে অসতী জেনেও তাকে আমি ভালবাসতাম। এখন মনে হচ্ছে, হয়তো অসতী ব'লেই বেশি ভাল লাগত তাকে। তা ছাড়া ভালবাসা ভাল-মন্দ সতী-অসতী বিচার করে না। ভেবেছিলাম—আশা করেছিলাম, সে ফিরে আসবে। কিন্তু এল না।

নির্ম্মলের প্রকাণ্ড চকচকে মোটরখানা চ'ড়ে সে আনন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমার ভাঙা কুঁড়েতে সে এল না।

তখন মৃত্যুরই শরণ নিলাম।

দেখলাম, উঠানের কল্‌কেগাছটায় অনেক ফল ধরেছে—অজস্র। যত্ন ক'রে গাছটা ছেলেবেলায় পুঁতেছিলাম, সে আমাকে স্নেহভরে ডাক দিলে। আকুল আগ্রহে ছুটে গিয়ে তার ফলগুলো কড়মড় ক'রে চিবিয়ে খেলাম। মৃত্যু হ'ল বটে, কিন্তু বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। সায়ানাইড খেলে শুনেছি কোন কষ্ট হয় না—"

"বাজে কথা।"

আর একজন আগাইয়া আসিল।

"আমি সায়ানাইড খেয়ে মরেছিলাম। ভয়ঙ্কর কষ্ট। তা ডাক্তারবাবু জানেন, কত কষ্ট! কিন্তু কষ্ট পেয়েছি ব'লেই সুখী, আরও কষ্ট পেলে আর একটু তৃপ্তি পেতাম। প্রায়শ্চিত্তটা পুরো হয়ে যেত। ভাবছ, প্রায়শ্চিত্তের জন্যে আমি এত ব্যগ্র কেন?—এ কি, কোথা গেল!" কল্‌কেফুলের বিচি খাইয়া যাহার মৃত্যু হইয়াছিল, সে তখন অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

চাহিয়া দেখিলাম, আগন্তুক একটি অল্পবয়স্ক যুবক। বয়স বড় জোর উনিশ কি কুড়ি। নিটোল স্বাস্থ্য—উন্নত প্রশস্ত ললাট, বিস্তৃত বক্ষ, সর্ব্বাঙ্গের মাংসপেশীগুলি সুপুষ্ট ও সুন্দর। সুবিন্যস্ত চুল। সুন্দর ভাসা ভাসা দুইটি চোখ। দাঁতগুলি পরিষ্কার ঝকঝকে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ যুবাটিকে দেখিলেই মন স্নেহসিক্ত হইয়া উঠে। আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—"গল্পটা

শুনতে চান কি? গল্প নয়, সত্য কাহিনী। সময় আছে আপনার? আপনি ডাক্তার মানুষ। আপনার সময়ের দাম আছে। সংক্ষেপে বলি।”

বলিয়া ছেলেটি একটু হাসিল। পরিষ্কার সুন্দর দাঁতগুলি থাকাতে হাসিটি তাহার সুন্দর।

“দেখুন, কলেজে পড়তাম। স্বপ্নের মত সেসব কথা মনে পড়ছে এখন। সে যেন একটা স্বপ্ন-জগতে বাস করতাম। প্রথম যেদিন বুঝতে পারলাম যে, আমাদের চিরপরিচিত জল দুটো গ্যাসের সম্মিলনে সৃষ্ট হয়েছে, সেদিন আমি অবাক হয়ে গেলাম। বিস্ময় ক্রমে বেড়েই চলল। সামান্য নুনের মধ্যে কে জানত অমন একটা দারুণ গ্যাস আছে—ক্লোরিন!”

বলিয়া খানিকক্ষণ সে চুপ করিয়া রহিল। তাহার সে তন্ময় আত্মমগ্ন রূপ দেখিয়া মনে হইল, সে যেন কিসের ধ্যান করিতেছে। চক্ষু দুইটি চাহিয়া আছে, অথচ কিছুই দেখিতেছে না।

“ভোল্টা, গ্যাল্‌ভানি, ল্যাভয়শেয়ার এদের জীবনী পড়লাম। দেখলাম, কি অদ্ভুত এদের সাধনা! সত্য আবিষ্কার করবার জন্যে কি তপস্যা! আমারও সাধ হ'ল, আমিও ওদের মত হব। কি আকুলতা নিয়েই যে সে দিনগুলো কেটেছে! হঠাৎ একদিন সব উল্টে-পাল্টে গেল। আমাদের সংসারে—আমার জীবনে—একটা আঁধি ঝড় এল। দাদাকে পুলিসে নিয়ে গেল।”

আবার সে চুপ করিল।

“বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল। অপরাধ—রাজদ্রোহ। সঙ্গে

সঙ্গে আমার বিচারেও ভোল্টা, গ্যাল্‌ভানি, ল্যাভয়শেয়ার সকলের ফাঁসি দিয়ে দিলাম। দাদা রাজদ্রোহী ছিলেন কি না জানি না, আমি কিন্তু হলাম অগ্নি—অগ্নিমন্ত্রের সাধক।”

বলিয়া সে একটু মৃদু হাসিল।

“আমার মত ভীরু ভাবপ্রবণ লোকের এ কাজে হাত দেওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু মায়ের অবিশ্রান্ত কান্না, বউদিদির বিধবা-বেশ, আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলেছিল। তখন বিচার করবার অবসর ছিল না, আমি এ কাজের উপযুক্ত কি না। তখন ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমি ভাবের বাষ্পে স্ফীত একটা রবারের রঙিন বেলুন মাত্র। আমার গায়ে আলপিনের খোঁচাটিও সইবে না। কিন্তু তখন বিচার করে কে? সামান্য ফানুস যখন আবেগভরে হঠাৎ আকাশে উড়ে গিয়ে নিজেকে নক্ষত্রদের সগোত্র ব'লে মনে করতে চায়, তখন সে বাধা মানবে কেন? আমিও মানলাম না। বোমার দলে ভিড়ে গেলাম। অগ্নিমন্ত্র! সুন্দর কথাটা। অগ্নিও যে না ছিল তা নয়।”

বলিয়া সে আবার একটু হাসিল।

“ও রকম অগ্নি আমি দেখি নি। দূর থেকে মনে হয় স্বপ্ন, কাছে গেলে মনে হয় শিখা। দূর থেকে কাছে টানে—কাছে গেলে দূর ক'রে দেয়। হেঁয়ালি ভেঙেই বলি—প্রেমে পড়লাম। আমাদেরই দলের একটি মেয়ে। ‘আনন্দমঠ’ পড়েছেন? মেয়ে জুটেই সব মাটি হয়ে গেল। আমাদেরও তাই হ'ল। আমাদেরও কাজ হ'ল, তার মনস্তুষ্টি করা। সবাই মিলে তার চারিদিকে ঘিরে

দাঁড়ালাম। সেই হ'ল আমাদের আরাধ্য দেবতা—দেশ নয়। সেই হ'ল লক্ষ্য—দেশ উপলক্ষ্য মাত্র।"

আলোটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গুঞ্জন-ধ্বনি শুনিতে পাইলাম।

প্রজাপতি আলোকশিখাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে—"তোমার জ্যোতি আছে, শিখা আছে, উত্তাপ আছে স্বীকার করি। কিন্তু কত ক্ষুদ্র তুমি—কত হীন তুমি! সামান্য একটা কাচের কারাগারে বন্দী হইয়া আছ! তুমি কি অগ্নি? তুমি কি সেই অনলের সগোত্র, যাহার দ্যুতি সূর্য্যে নক্ষত্রে বিদ্যুতে ইন্দ্রধনুতে নিত্য প্রতিভাত? দাবানলে, বাড়বানলে যাহার প্রকাশ? তাই যদি হয়, তাহা হইলে ধিক্, শত ধিক্ তোমাকে! দেবতা তুমি, সামান্য মানবের হস্তে বন্দী হইয়া সামান্য ভৃত্যের ন্যায় জীবন-যাপন করিতেছ!"

"স্বদেশ উদ্ধারের নেশা ছুটে গেল,"—যুবকটি বলিতে লাগিল—"নতুন নেশায় বিভোর হয়ে গেলাম। অদ্ভুত সে উন্মাদনা! ভোল্টা, গ্যাল্‌ভানি, ল্যাভয়শেয়ার, শোকাতুরা মা, সদ্য-বিধবা বউদিদি, দেশের কাজ—সব ভেসে গেল। শুধু সে আর আমি। সে দেবী, আমি তার পূজারী। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম—নিজের চোখে দেখলাম, সে বরদান করেছে আর একজনকে। নিজের চোখে দেখলাম, সে আর একজনের—আমার নয়। সেই আর একজন কে জানেন? আমারই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। স্ফীত রবারের বেলুনটায় এবার আলপিনের খোঁচা লাগল।

নিমেষের মধ্যে চুপসে গেলাম। অ্যাপ্রুভার হয়ে তাকে ধরিয়ে দিলাম। বন্ধু? হ্যাঁ, বন্ধু ছিল বইকি—অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অমন বন্ধু জীবনে পাই নি, পাবও না। তথাপি ধরিয়ে দিলাম তাকে। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ ঈর্ষার শরশয্যায় শুয়ে ছটফট করছিল। ধরিয়ে না দিয়ে পারলাম না। কাগজে আপনারা পড়েছেন নিশ্চয়। কাগজে যা বেরিয়েছে, তা ভুল। তাকে ধরিয়ে দেবার আসল কারণ এই। তার ফাঁসি হয়ে গেল। আমি ছাড়া পেয়ে গেলাম। সেই মেয়েটি? সে ধরাই পড়ে নি।

দেবীপূজায় সাধারণত পশু বলিদান দেওয়া হয়। আমি দেবীপূজায় আমার বন্ধুর মত অত বড় একজন মহামানবকে বলিদান দিলাম—আমার বিবেককে বলিদান দিলাম—আমার যা কিছু প্রিয় ছিল, সব ত্যাগ করলাম। দেবী কিন্তু প্রসন্ন হ'ল না। দেবী কি করলে, বলুন দেখি?”

বলিয়া ছেলেটি আমার দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। তাহার পর বলিল—

“না না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আত্মহত্যা সে করে নি—সন্ন্যাসিনীও হয়ে যায় নি। সে বিয়ে করেছে একজন বিলেত-ফেরত আই. সি. এস.কে। তার জর্জেট শাড়ির এখন নিত্য নূতন রঙ। মোটর ছাড়া সে রাস্তায় বেরোয় না। নানা রঙের নানা আকারের ছোট কুকুর তার কোলে কোলে ফিরছে। হাতে অদ্ভুত রকম কাজ-করা ভ্যানিটি-ব্যাগ। সঞ্চারিণী অগ্নি-শিখার মত এখনও সে ঘুরে বেড়াচ্ছে।”

যুবক চুপ করিল। দেখিলাম, তাহার ভাসা ভাসা বড় চক্ষু দুইটিতে অশ্রু টলটল করিতেছে।

"আমাকে কিন্তু সে ভোলে নি। তার সুপারিশের জোরেই তার আই. সি. এস. স্বামী আমাকে একটা চাকরি ক'রে দেবেন ব'লে ভরসা দিয়েছিলেন। আমাকে মাঝে মাঝে টি-পার্টিতে নেমন্তন্নও করতেন। কিন্তু পারলাম না। সায়ানাইড সংগ্রহ করতে হ'ল। কষ্ট হয়েছিল বইকি। কিন্তু ওঁর মুখে শুনলাম, কল্‌কেফুলের বিচি আরও কষ্টকর। আগে জানলে তাই খেতাম। আমার শাস্তি হওয়ার দরকার আছে। লোকে ফাঁসির পর কোথা যায় জানেন?"

"জাহান্নামে।"

চমকাইয়া উঠিলাম।

দেখিলাম, কুচকুচে কালো দীর্ঘাকৃতি একটা লোক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এত কালো লোক খুব কম দেখা যায়। মাথার চুল কোথায় শুরু হইয়াছে বোঝা যায় না—এত কালো। প্রকাণ্ড তাহার মাথাটা। ভাঁটার মত বড় বড় চোখ দুইটা অদ্ভুত রকম সাদা। ঠোঁটে ধবল কুষ্ঠ। গলদেশে ভীষণ একটা কাটা ঘা দগদগ করিতেছে।

লোকটা সেই স্বদেশী যুবকটির দিকে ফিরিয়া আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—"জাহান্নামে গিয়ে খোঁজ কর্। ও-রকম ফাঁসির

আসামীরা সেইখানে যায়। তুমিও সেইখানে—জাহান্নামে যাও—সব্বাই তোমরা জাহান্নামে যাও।”

তাহার স্বর উত্তরোত্তর চড়িতে লাগিল।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্ষতটা ভরিয়া রক্তের বুদ্বুদ ফেনাইয়া উঠিল। স্বদেশী যুবকটি নিমেষে অন্তর্হিত হইল।

তখন সেই কৃষ্ণমূর্ত্তি আমার দিকে আরও খানিকটা আগাইয়া আসিয়া তাহার গলাটা বাড়াইয়া দিল—“দেখ তো ডাক্তার, সেলাই-টেলাই ক'রে এটাকে কোনক্রমে জোড়া লাগানো যায় কি না! বড় দুঃখে বড় জোরের সঙ্গে ক্ষুরটা চালিয়েছিলাম। ভাল ক্ষুর ছিল। বেশ দাম দিয়ে কিনেছিলাম। বেইমানি করে নি। ম'রে এখন আফসোস হচ্ছে।…আমার অতগুলো ছেলেমেয়ে না খেতে পেয়ে ম'রে যাবে যে! তিন মাসের বাড়িভাড়া বাকি ছিল—বাড়িওলা নিশ্চয়ই তাদের পথে বার ক'রে দিয়েছে। আমার গলাটা জুড়ে দাও ডাক্তার—আমি ফিরে যাই আবার।”

বলিয়া সে তাহার গলাটা বাড়াইয়া রহিল।

“দাও না জুড়ে গলাটা।”

কি বলিব, চুপ করিয়া আছি।

“দেবে না জুড়ে?”

“ও আর জোড়া যাবে না।”

“তাই নাকি? টং টং ক'রে নগদ ফীস গুনে দিলে যাবে না? তোমরা তো টাকা পেলে সব পার।”

বলিয়া লোকটা আবার হাসিতে লাগিল। আবার তাহার

গলার ক্ষতে রক্ত ফেনাইয়া উঠিল। সমস্ত মুখে তিক্ত বিদ্রূপের হাসি।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

"রাগ করলে ডাক্তারবাবু? রাগ ক'রো না। বড় দুঃখে বলেছি কথাটা। দুনিয়ার কেউ আমার প্রতি সুবিচার করে নি—কেউ না। জীবনে যতটুকু সুবিধে পেয়েছি, টাকা দিয়ে কিনতে হয়েছে। বেটাছেলে হয়ে জন্মেছিলাম ব'লেই বোধ হয় মা ছেলেবেলায় বিনা পয়সায় দুধ খেতে দিত—ভবিষ্যৎ-লাভের আশায়। মেয়ে হয়ে জন্মালে অশেষ দুর্গতি হ'ত। আমার একটা বোন ছিল, আমারই মত কুৎসিত। মা তো সেটাকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না। মাই-দুধ হয়তো তাকে দিয়েছিল—মাই টনটন করত ব'লে, গাই-দুধ কখনও তাকে খেতে দেখি নি। বাবা মা উভয়ে এ বিষয়ে একমত ছিলেন—'মেয়েমানুষে আবার দুধ খাবে কি?' এর চেয়ে রাজপুতরা ঢের বেশি সদাশয় ছিল—মেয়ে হ'লে আঁতুড়ঘরেই মুখে নুন দিয়ে মেরে ফেলত। আফ্রিকায় শুনেছি কচি কচি মেয়েকে বঁড়শিতে গেঁথে ওরা কুমীর ধরে। মেয়ের চেয়ে কুমীর দামী জিনিস। একটা কুমীর ধরতে পারলে অনেক টাকা হয়। বাপ-মাই যখন টাকার অনুপাতে ছেলেমেয়েদের প্রতি কম-বেশি ভালবাসা দেখান, তখন তোমরা টাকা না পেলে—"

আমি বলিলাম—"ভুলে যাচ্ছ কেন যে, তুমি ম'রে গেছ? মরা মানুষ বাঁচাতে পারি কি আমরা? টাকা পেলেও পারি না।"

লোকটা আবার হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"আমার বিশ্বাস টাকা পেলে মরা মানুষও বেঁচে ওঠে। দিতে পার আমাকে কিছু টাকা? এক্ষুনি দেখ বেঁচে উঠব।"

"কত টাকা চাই তোমার?"

"দেবে—দেবে? ভারি ভাল লোক তো তুমি!"

"ওই সামনের দেরাজে, টেনে দেখ। যা আছে নিয়ে যাও।"

"কোথা? কোন্ দেরাজে?"

দেরাজটা দেখাইয়া দিলাম। লোকটা লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া সেই দিকে চলিয়া গেল। আমি আবার পুস্তকে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় সে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল—

"এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! আমি দেরাজের হাতলটা কিছুতেই ধরতে পারলাম না। কেমন যেন ফসকে ফসকে যাচ্ছে। আমার দেহটা কি হাওয়া হয়ে গেছে?"

বলিয়া সে বারম্বার নিজের প্রসারিত বাহু দুইটা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হাত দুইটা বারম্বার মুষ্টিবদ্ধ করিয়া খুলিয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার সমস্ত মুখে এক বিচিত্র হাসি। খানিকক্ষণ পরে সে আবার বলিল—"তাই তো! সব বদলে গেছে দেখছি। আমাকে দেখতে পাচ্ছ তুমি?"

"হ্যাঁ।"

"আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?"

"পাচ্ছি।"

"কিন্তু আমার সব বদলে গেছে। সব হাওয়া হয়ে গেছে—শক্ত আর কিছু নেই। দেরাজটা খুলতে পারলাম না। টাকা পেলে হয়তো বেঁচে যেতাম। এখন টাকা পেয়েও যে নিতে পারছি না! আহা, বেঁচে থাকতে তোমার সঙ্গে যদি দেখা হ'ত—হয়তো আমি মরতাম না। হয়তো আমার—"

"কেন মরেছিলে তুমি?"

"কেন? ওই যে ছোঁড়াটা এসে বক্তৃতা দিচ্ছিল—ওরাই তো আমার এই দুর্দ্দশার কারণ। পথে ঘাটে কাগজে দেওয়ালে এক রব তুললে—'বয়কট ফরেন গুড্‌স'। এই সব ছোকরাদের বক্তৃতার চোটে আমার দোকানখানা ডুবে গেল। আমার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কি সব পিকেটিং করবার ধুম! 'বয়কট ফরেন গুড্‌স'! ওদের ওই বুলিটাই যে 'ফরেন', সে তখন ওদের বোঝাবে কে? দোকানখানা আমার ডুবিয়ে দিলে ব্যাটারা। আমাকেও ডুবিয়ে দিলে।...সে দোকান থাকলে কি আমার মেয়ের বিয়ের পণের অভাব হয়?"

লোকটা হাঁফাইয়া পড়িয়াছিল। একটু থামিয়া আবার শুরু করিল—"বাজারে ধার বাড়তে লাগল। মেয়েরও বয়স বাড়তে লাগল। আমার মেয়ে, বুঝতেই পারছেন, কি রকম কালো সে। বাজার-দর যাচিয়ে দেখলাম। অন্তত পক্ষে তিনটি হাজার টাকা দরকার। সদাগরী আপিসের একটি প্রৌঢ় কেরানীর দ্বিতীয় পক্ষ করার দরকার হয়ে পড়েছিল। তিনি বললেন যে, একটি প্রতিমার মত পাত্রী তাঁর জন্যে সেজে ব'সে

আছে দুটি হাজার টাকা নিয়ে। মিছে কথা নয়। ভেবে দেখলাম, আমার ওই মেয়ের যুবক পাত্র জোটানো আমার পক্ষে অসম্ভব। অন্তত পক্ষে কুড়িজন ছোকরাকে জলখাবার খাইয়েছি—কেউ মেয়ে পছন্দ করে নি। শেষে সদাগরী আপিসের সেই কেরানীবাবুটিকেই ধ'রে পড়লাম আমার শালার মারফৎ। আমার শালার সঙ্গে তিনি একসঙ্গে পড়েছিলেন। তিনি অবশেষে দয়া ক'রে আমার কালো মেয়েকেই বিয়ে করতে রাজী হলেন—কিন্তু তিনটি হাজার টাকা চাই। আমার হাতে তখন তিনটি টাকা নেই। টাকার জন্যে পাগলের মত ঘুরতে লাগলাম। কত লোকের কাছে যে হাত পেতেছি! মাঝে মাঝে চুরি করতেও ইচ্ছে হয়েছে। আহা, তখন যদি আপনার সঙ্গে দেখা হ'ত! কিন্তু টাকার আমার আর দরকার হ'ল না। একদিন সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে দেখলাম, মেয়ে আমার উধাও হয়েছে। মজা দেখুন, মেয়ে কালো ব'লে পাত্র জুটল না, কিন্তু প্রণয়ী জুটে গেল! এর মূলেও ওই হতভাগা ছোঁড়াগুলো—ওই হারামজাদা ব্যাটারা—জাহান্নামে যাক সব।"

তাহার গলার ক্ষত দিয়া দরদর করিয়া রক্ত পড়িয়া তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। যাইবার পূর্ব্বে সে বলিয়া গেল—

"তবু আমি মরতাম না। কিন্তু মুখরা স্ত্রীর বাক্য-যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারলাম না। আশ্চর্য্য, কিন্তু এখন তার জন্যেই মন-কেমন করছে। সত্যি বলছি, বড্ড মন-কেমন করছে।"

ছায়া-মূর্ত্তি মিলাইয়া গেল।

ঘড়িতে টং টং করিয়া কয়টা বাজিল, গুনিলাম না। প্রবৃত্তি নাই।

চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ।

একা বসিয়া আবার সেই ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডের গল্পে মনোনিবেশ করিয়াছি। দুইজনে বরফ-গলা শীতল জল সাঁতার দিয়া পার হইতেছে—সেই যুবক এবং যুবতী। কেহ কাহারও ভাষা বোঝে না।

যুবক সুইডেনবাসী—যুবতী ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডবাসিনী। যুবক বলিতেছে—

"ওপারে গিয়ে যখন উঠলাম, তখন শরীর ঠাণ্ডায় প্রায় জ'মে গেছে। ওপারের তীর কিন্তু সমতল নয়—চড়াই ভেঙে উঠতে হয়। উঠতে উঠতে শরীর গরম হয়ে উঠল। মেয়েটি বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা বলছিল না। বললেও বিশেষ কিছু সুবিধা হ'ত না—তার ভাষা আমার পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। চড়াই ভেঙে আমরা একটু পরে ওপরে উঠলাম। ওপরে উঠে আমরা শৈবালাসনে ব'সে আহারে প্রবৃত্ত হলাম—যবের শুকনো রুটি, টাটকা মাখন আর পনির। ধোঁয়ায়-সেঁকা বল্‌গা-হরিণের জিবও ছিল। মেয়েটি তার মগে ক'রে পাহাড়ী ঝরনার ঠাণ্ডা জল নিয়ে এল। এত তৃপ্তি ক'রে বহুকাল খাই নি। খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনে পাইপ ধরিয়ে ব'সে পরস্পরের ভাষা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

২৬০

'ওই পাখিটির নাম জান ?' তাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'লাহোল্।' হেসে মেয়েটি উত্তর দিলে।

পাখিটির গলার স্বর ঠিক বাঁশীর মত—ভারি কোমল। ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডবাসীদের নির্জ্জনতার সহচর এই পাখিটি। কাছেই একটি ঝোপ থেকে আর একটি পাখি গান গেয়ে উঠল: আশ্চর্য্য তার স্বর—নীল রঙের গলাটি !

'জিলো—জিলো—' মেয়েটি হেসে ব'লে উঠল।

ল্যাপদের ধারণা এই নীলকণ্ঠ পাখিটির গলার ভেতরে নাকি একটি ঘণ্টা আছে আর এরা নাকি একশো রকম বিভিন্ন সঙ্গীত জানে। ঠিক আমাদের মাথার ওপর প্রকাণ্ড একটা কালো ক্রস নীল আকাশের গায়ে স্থিরনিবদ্ধ হয়ে আছে দেখলাম। পক্ষীরাজ ঈগল তার গতিবেগকে সংহত ক'রে নিজের নির্জ্জন সাম্রাজ্য পরিদর্শন করছেন। দূরে পাহাড়ের হ্রদ থেকে হাঁসের বিচিত্র শব্দ ভেসে আসছে। সমস্তটা যেন ইন্দ্রজাল !

'রো—রো—রেইক্—' মেয়েটি বলতে লাগল।

এর অর্থ—'আজ দিন ভাল—আজ দিন ভাল।'

হ্রদ থেকে হাঁস উত্তর দিলে—'ভার লুক্, ভার লুক্, লুক্ লুক্।'

মানে—'বৃষ্টি হবে, বৃষ্টি হবে,—হবে হবে।'

আমি সোজা লম্বা হয়ে শুয়ে দেখতে লাগলাম, মেয়েটি তার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছে। একটি ছোট নীল উলের [illegible],

আর এক জোড়া হরিণের চামড়ার সুন্দর জুতো, চার্চে পরবার জন্যে চমৎকার এম্‌ব্রয়ডারি-করা এক জোড়া লাল দস্তানা, একটি বাইবেল। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম—কি সুন্দর তার হাত দুটি!"

"ডাক্তারবাবু, শুনুন। সেই মেয়েটি যদি আসে, সেই কালো মেয়েটি—" দেখিলাম সেই কবি আসিয়াছে। বই বন্ধ করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া বসিলাম। তাহার মাথার ফাটা খুলিটা হইতে আরও খানিকটা রক্তমাখা মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

"দেখুন ডাক্তারবাবু, সেই মেয়েটি যদি আসে, সেই কালো মেয়েটি—তাকে বলবেন যে, তার জন্যে একটা কবিতা লিখেছিলাম। তাকে শোনানো হয় নি। শোনাবার অবসর পাই নি—অবসর সে দেয় নি।"

তাহার পর একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—

"শুনবেন আপনি? আপনি ডাক্তার মানুষ, আপনার হয়তো কবিতা ভাল লাগে না। তবু—"

তাহার সমস্ত চোখে মুখে কেমন একটা করুণ মিনতি ফুটিয়া উঠিল। সেতারের তারে ঝঙ্কার দিলে তারগুলি যেমন কাঁপিতে থাকে, তাহার দৃষ্টি দেখিলাম সেইরূপ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

"শুনবেন কবিতাটা? সে যদি আসে, বলবেন তাকে—"

"আচ্ছা।"

কবি আবৃত্তি করিতে লাগিল। বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। শুনিতে শুনিতে আমার মনটাও সুদূর অতীতে ফিরিয়া গেল।—

"তুমি এসেছিলে।
বহি সুখ, বহি দুঃখ, বহি জ্বালা, বহি জটিলতা
এসেছিলে জীবনে আমার।
ক্ষুদ্র জলাশয়
সহসা ধরিয়াছিল সাগরের রূপ
তব আবির্ভাবে।
রবি-শশী-গ্রহ-তারা-দীপ্ত নীলাকাশ,
পথহারা কত ধূমকেতু
প্রসব-বেদনাতুরা কত নীহারিকা
সন্ধ্যা, উষা, জ্যোৎস্না, অন্ধকার,
সেই সাগরের বুকে ধরেছিল মূর্ত্তি অভিনব
বহুবর্ণ-বিচ্ছুরিত স্বপন-উৎসবে।

কোটি-উর্ম্মি-শিহরিত সে সমুদ্র-মাঝে
কত কি যে ছিল!
কি ঐশ্বর্য্য—কি দারিদ্র্য তার!
সূর্য্যালোকহীন সেই আঁধার অতলে
মুক্তা ছিল, শঙ্খ ছিল—আছিল কত কি!
ছিল কত নামহীন অপরূপ রূপের প্রকাশ!

বাড়ব-অনল
জ্বলিয়া মরিত সেথা নীরব জ্বালায়।
অনুত্থিতা উর্ব্বশীর অন্ধ আকুলতা
ছন্দোহীন বেদনায় মরিত কাঁদিয়া।
কত সর্প, কত অজগর
বিচিত্র কুণ্ডলাকারে—ভীষণ, মোহন,
পিচ্ছিল, চিক্কণ দেহ দিত প্রসারিয়া
রক্তবর্ণ প্রবাল-পল্লবে।"

শুনিতে শুনিতে আমি মানসচক্ষে দেখিতে লাগিলাম, একটি কৃশ দরিদ্র যুবক নগ্নপদে পথ অতিবাহন করিতেছে। পেটে অন্ন নাই, মাথার চুল তৈলহীন, পরিধানে ছিন্নবাস। কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। চক্ষু দুইটিতে তাহার তীব্র জ্যোতি—অন্তরে অমৃতের পিপাসা। অমৃতের প্রলোভন দেখাইয়া একটি কিশোরী তাহাকে ডাকিতেছে। সে চলিয়াছে তাহারই আহ্বানে। কিশোরীর আয়ত নয়ন দুইটিতে কি অপূর্ব্ব রসাভাস—ভাষাহীন সে কি নীরব নিবেদন!

"গহন সে জলতলে তরঙ্গ তুলিয়া
লোলুপ আগ্রহভরে প্রসারিয়া অষ্টবাহু তার
লুব্ধ মুগ্ধ
ছিল 'অক্টোপাস'।
রক্তলোভী 'শার্ক'
সু-সতর্ক সঞ্চরণে ফিরিত সতত।

গভীর সে কালো জলে
আলোড়ন তুলি
উন্মাদিনী কত ঝঞ্ঝা প্রলয়-তাণ্ডবে
বিধুনিয়া জলরাশি মহা-অট্টহাসে
সুসজ্জিত কত তরী ডুবাল অতলে।

আরও যে কত কি ছিল
দেখি নাই স্বরূপ তাদের।
চকিতে ইঙ্গিতে শুধু
পেয়েছি আভাস।
অনন্ত আভাস-ভরা সমুদ্র বিশাল।
নিত্য তারে সুরাসুর করিত মন্থন
মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃতের লাগি।
মোর তুচ্ছ জীবনের ক্ষুদ্র জলাশয়
সহসা ধরিয়াছিল সাগরের রূপ
তব আবির্ভাবে।"

"খুলে দাও, খুলে দাও, বাঁধনটা খুলে দাও তো—"

চাপা রুদ্ধস্বরে কথা বলিতে বলিতে একটি যুবতী আগাইয়া আসিল। তাহার রক্তাক্ত চোখ দুইটা যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। গলার দড়িটা শক্ত করিয়া বাঁধা। দুই হাত দিয়া টানাটানি করিয়া নিজেই সে বাঁধনটা আলগা করিয়া

ফেলিল। আলুলায়িত তাহার দীর্ঘ কুন্তল। পাতলা ঠোঁট দুইটিতে বিচিত্র হাসি।

"কোথায় গেলেন সেই কবি? কবিতা যে শেষকালে মৃত্যুর ফাঁসি হয়ে গলায় চেপে বসে, এ খবর কি উনি জানেন?

উঃ, কত কবিতাই জীবনে শুনলাম!

এই রূপের কত ব্যাখ্যা!

যেখানেই যাই, সহস্র চক্ষু আমার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকে—যেন গিলে খাবে। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান, বালক, বৃদ্ধ, যুবা—সকলেরই চোখে সেই একই ক্ষুধিত দৃষ্টি। কবি কবিতা লিখেছে, ধনী টাকা দেখিয়েছে, বলী বলপ্রকাশ করেছে, যার কিছু নেই—নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, সে মিনতি করেছে। অসহ্য!"

মেয়েটি তাহার পর আমার আর একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—"আচ্ছা, ডাক্তারবাবু, একটা কথা বলতে পারেন আমাকে? ছাপা কেতাবে যে সব প্রেমের গল্প লেখা থাকে, সে সব কি সত্যি? ও-রকম কি হয়? আমার জীবনে আমি তো দেখেছি, পুরুষগুলো আমাকে নিয়ে লোফালুফি করেছে খালি। আমি যেন একটা ফুটবল, আর আমায় ঘিরে সুদক্ষ একদল খেলোয়াড়।—সবারই লোলুপ দৃষ্টি আমার ওপর। কিন্তু আমাকে কাছে পাওয়া মাত্র লাথি মেরে তারা দূর ক'রে দিয়েছে। দূর ক'রে দিয়ে আবার ছুটেছে আমার পেছনে আমাকে ধরবে ব'লে। এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার বলুন তো!"

বলিয়া মেয়েটি আগাইয়া আসিয়া বাতিটার কাছে দাঁড়াইয়া আলোর পোকাগুলি দেখিতে লাগিল। কতকগুলি মরিয়া গিয়াছে, কতকগুলি মৃতপ্রায়—কতকগুলি এখনও বাঁচিয়া আছে। রঙিন প্রজাপতিটি এখনও সমানে আলোকশিখাকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়াছে।

"ডাক্তারবাবু, তখন তো বললেন না আমাকে—মানুষ ফাঁসি হ'লে কোথায় যায়? বলুন না!"

সেই স্বদেশী যুবকটি আসিয়াছে।

"বলুন না!"

"আমি ঠিক জানি না।"

"জানেন না?"

"না।"

"আচ্ছা, ভোল্টা, গ্যাল্‌ভ্যানি, ল্যাভয়শেয়ার, পাস্তুর, গ্যালিলিও—এঁরা কেউ আসেন আপনার কাছে? এঁদের আমি অপমান করেছি—ক্ষমা চাইব। কেউ আসেন এঁরা?"

"না।"

যুবকটি চলিয়া গেল। অদ্ভুত তাহার দৃষ্টি!

মেয়েটি আলোর পোকাগুলি এতক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। যুবকটি চলিয়া যাইবার পর আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ও কে?"

যতটুকু জানিতাম, বলিলাম।

মেয়েটি হাসিয়া বলিল—"সবারই পরিচয় শুনেছেন, আমার

পরিচয় শুনুন। আচ্ছা, ওই ছেলেটি যাদের নাম করছিল, তারা কে? কি অদ্ভুত নামগুলো! কারা ওরা?"

"ওঁরা সব বড় বড় বৈজ্ঞানিক। সবাই মারা গেছেন। ছেলেটি তাঁদেরই খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"ছেলেটি খুব বিদ্বান বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

মেয়েটি কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া গেল। তারপর বলিল—"শুনবেন আমার কথা?"

"বল।"

"ভাল ব্রাহ্মণবংশের মেয়ে আমি। আমার মা নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা ছিলেন। মাসের মধ্যে অধিকাংশ দিনই উপবাস ক'রে থাকতেন। আমরা গরিব হ'লেও মায়ের নিষ্ঠার জোরে আমাদের খাতির ছিল খুব। মায়ের মুখখানা এখনও আমার মনে পড়ে। ধপধপে ফরসা ছিলেন তিনি, ধপধপে ফরসা থান প'রে থাকতেন।"

মেয়েটি একটু চুপ করিল।

"অমন মায়ের মেয়ে হয়ে কি ক'রে যে আমি এমন হলাম, তাই ভাবি। আমার যখন ন বছর বয়স, তখনই আমার বিয়ে হয়েছিল। মা গৌরীদান ক'রে পুণ্য অর্জ্জন করেছিলেন। পাড়ার লোককে বলতে শুনেছি যে, আমি নাকি গৌরীর মত দেখতে ছিলাম। আমার এই রূপের জোরেই একটি বড়-লোকের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। কোন গরিবের

হাতে পড়লে বোধ হয় আমার এ দুর্দ্দশা হ'ত না।" একটু হাসিল।

"সবাই আমার এই রূপের প্রশংসা করেছে—কেবল আমার স্বামী ছাড়া। তিনি আমার দিকে কোনদিন চেয়েও দেখেন নি বোধ হয়। মদ নিয়ে এত মশগুল থাকতেন যে, আমার প্রতি দৃষ্টি দেবার তাঁর অবসর হ'ত না। তিনি আছেন টের পেতাম, যখন রাত্রে তাঁর দুর্গন্ধ বমিগুলো পরিষ্কার করতে হ'ত। স্বামী দেবতা হ'লেও ভাগ্যে অমর নয়। তাই নিষ্কৃতি পেয়ে গেলাম। দেবতারা শুনেছি স্বর্গে থাকেন। পচা লিভারটা নিয়ে আশা করি তিনিও স্বর্গেই আছেন। যান…যেতে চাই না আমি সে স্বর্গে।"

তাহার চোখে মুখে যেন একটা আগুনের হলকা বহিয়া গেল।

"স্বামী স্বর্গে গেলেন যখন, তখন আমার বয়স তেরো বছর। বিয়ের সময় শুনেছিলাম, তাঁরা বড়লোক। বড়লোক ছিলেন। আমার স্বামীর প্রপিতামহ টাকা রোজগার করেছিলেন—এঁরা দু-তিন পুরুষ ধ'রে সেটা নানা ভাবে খরচ করছিলেন। আমার স্বামীর অংশে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, সেটুকু তিনি মদ খেয়ে নিঃশেষে খরচ ক'রে মরবার আগে কিছু ধারও রেখে গেলেন। ভাল লাগছে শুনতে আপনার?"

"ভাল লাগছে না। তবু বল।"

"ভাল লাগছে না? পচা মড়া চিরতে ভাল লাগে, মিথ্যে

প্রেমের উপন্যাস পড়তে ভাল লাগে, আর আমার জীবনের এই সত্যি ঘটনাটা ভাল লাগছে না?"

"সত্য সর্ব্বদাই অপ্রিয়। তুমি বল।"

মেয়েটি বলিতে লাগিল—

"হ্যাঁ, কি বলছিলাম! স্বামী স্বর্গে চ'লে গেছেন। আমি মর্ত্ত্যে থেকে গেলাম। আর থেকে গেলেন আমার স্বামীর মামাতো ভাই, পুলক ঠাকুরপো। তিনিই আমার প্রথম প্রেমিক।" বলিয়া মেয়েটি একটু মুচকি হাসিয়া বলিল—"আমাদের দেশে সতীদাহ প্রথাই ঠিক ছিল, স্বামীর সঙ্গে মেয়েটাকে পুড়িয়ে মেরে ফেলত, বাস্, নিশ্চিন্ত! এ রকম দ'গ্ধে দ'গ্ধে মরতে হ'ত না। এই দেশে কখনও সতীদাহ প্রথা লোপ পেতে পারে? আজও এ দেশের ঘরে ঘরে বিধবা সতীরা পুড়ে মরছে। আগুনের চেহারাটা শুধু বদলেছে। আগে ছিল চিতানল, এখন হয়েছে তুষানল। আমার সারা জীবন ভ'রে তার প্রমাণ পেয়েছি। এই তুষানল নেবাবার নানা চেষ্টা আমি করেছি, জল পাই নি। নরকে কখনও জল পাওয়া যায়? পাই নি। এই মর্ত্ত্যলোকই আমার কাছে নরক হয়ে উঠেছিল, আর সে নরক আমি গুলজার ক'রেও তুলেছিলাম। কি ক'রে আমার এই সামান্য দেহটা দিয়ে যে এত লোককে আমি কাবু করেছিলাম, তাই ভাবি। সে কি এক-আধটা লোক? প্রতি দিন প্রতি বেলা নুতন লোক। একটা সামান্য বারাঙ্গনার জীবন-কাহিনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ক'রে আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাব না। এইটুকু শুধু জেনে রাখুন, সাধ

ক'রে গলায় দড়ি দিই নি। সম্ভব হ'লে ছ্যাকড়া-গাড়ির ঘোড়াগুলোও আত্মহত্যা করত। পারে না ব'লেই করে না।

জীবনে আমার সবচেয়ে বেশি দুঃখ কি জানেন? কাউকে ভালবাসি নি। ভালবাসবার মত কেউ আমার কাছে আসে নি। অথচ টাকার লোভে অহরহ ভালবাসার ভান করতে হয়েছে। কি আশ্চর্য্য এই পুরুষমানুষগুলোর প্রবৃত্তি! তারা ঘরে সতী স্ত্রী ফেলে আমাদের কাছে ছুটে আসে। আমার স্বামীও যেতেন শুনেছি। পুরুষদের ষোল-আনা লোভ এই অসতী মেয়েগুলোর প্রতি। অসতী জেনেই তারা আমাদের কাছে আসে, অথচ এসেই একনিষ্ঠতা দাবি ক'রে বসে। আর আমরাও টাকার লোভে একনিষ্ঠতার অভিনয় করতে থাকি। মরেছি কি সাধে?"

বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে চলিয়া গেল।

খোলা জানালাটা দিয়া হু-হু করিয়া একটা হিমশীতল বাতাস ঘরে আসিয়া ঢুকিতে লাগিল।

সেই প্রজাপতি শুনিলাম আলোকশিখাকে বলিতেছে—

"আমি নীলাকাশচারী জ্যোতির্ম্ময় সবিতার উপাসক, মুক্ত আলোকে, নির্ম্মল বাতাসে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াই। এই রুদ্ধ ঘরের সঙ্কীর্ণতায় আমার সমস্ত অন্তর অবরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে।"

বাতায়ন-পথে আবার খানিকটা ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকিল। আলোকশিখা দেখিলাম, একটু কাঁপিয়া আরও যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

পতঙ্গ আবার তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মৃদু গুঞ্জনে কি যেন বলিতে লাগিল, বুঝিতে পারিলাম না।

বিনিদ্র নয়নে বাতায়নের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি।

আশ্চর্য্য আমার এই বাতায়নটি! এই বিশ্বজগতের তুলনায় ইহা তো কিছুই নয়। আকাশভরা লক্ষ কোটি নক্ষত্রসমাজে কত ক্ষুদ্র আমাদের এই সৌরজগতের সীমাই! সেই সৌরজগতের ক্ষুদ্র একটি গ্রহ আমাদের পৃথিবী! সেই পৃথিবীর এক কোণে কত নগণ্য আমার ছোট ঘরখানি! সেই ঘরের দেওয়ালে ছোট একটি জানালা। কত সামান্য, অথচ কত অসামান্য! এই ক্ষুদ্র বাতায়ন-পথে বাহিরের পৃথিবীর খবর পাই। আকাশপটে বিশ্বরূপ দেখি। আলো আসে, অন্ধকারও আসে।

"ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, দেখ তো—"

সেই সন্তানহত্যাকারিণী জননীটি আসিয়াছে। কোলে তাহার একটি মরা শিশু।

"দেখ তো ডাক্তারবাবু, এখনও বেঁচে আছে কি না! মনে হচ্ছে, বুকের কাছে যেন এখনও একটু ধুকধুক করছে। দেখ না একটু। নদীর ধারে প'ড়ে ছিল। একটা কুকুরে-এর হাতটা চিবিয়ে খাচ্ছিল। দেখ না—বেঁচে আছে কি না!"

মৃত শিশুটা সে বাড়াইয়া ধরিল। নিস্পন্দ প্রাণহীন দেহ। একটা চোখ নাই—হয়তো কাকে ঠুকরাইয়া তুলিয়া ফেলিয়াছে।

কচি হাতটিতে সত্যই কয়েকটি আঙুল নাই, কুকুরে চিবাইয়া খাইয়াছে।

"ডাক্তারবাবু, এখানে এই কালো দাগ্‌টা কিসের ?"

"ওই জায়গাটায় তুমি টিপে ধরেছিলে।"

ছেলেটি কোলে করিয়া যুবতী দেখিলাম থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

"এখনও যে এর একটু একটু নিশ্বাস পড়ছে। বেঁচে আছে কি ? দেখ না একটু।"

কি বলিব ?

মিথ্যা কথা বলিলাম।

"হ্যাঁ, এখনও প্রাণ একটু আছে।"

"আছে ?"

চুম্বনে চুম্বনে উন্মাদিনী সেই মৃত শিশুটার সর্ব্বাঙ্গ যেন ভরিয়া দিল। তাহার অঙ্গের বসন বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, বেণী বিস্রস্ত—"বাবা আমার, মানিক আমার, সোনা আমার—"

বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, মৃত শিশুর অধর দুইটি যেন নড়িয়া উঠিল, অভিমানভরে সে যেন বলিল, মা—মা !

বাহিরে হাওয়ার বেগ বাড়িতেছে।

জানালা দিয়া দেখিতেছি, ঘনকৃষ্ণ পুঞ্জীভূত মেঘমালা আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে ছুটিয়া চলিয়াছে। নক্ষত্রবিহীন অন্ধ রাত্রি ঘনাইয়া আসিল। চিরকালের সেই

উজ্জ্বল শাশ্বত নক্ষত্রগুলি দেখিতে পাইতেছি না। সামান্য মেঘের কি অসামান্য ক্ষমতা, নক্ষত্র বিলুপ্ত করিয়া দেয়!

সমস্ত তিমির ভেদ করিয়া মন সুদূরে ভাসিয়া চলিয়াছে। সীমাহীন স্মৃতির সমুদ্রে সমস্ত অন্তঃকরণ হাবুডুবু খাইতেছে। যেন একখানি ক্ষুদ্র অসহায় ভেলা। চতুর্দ্দিকে কোটি তরঙ্গ···। মানসচক্ষে একটি ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে।

গ্রামের একটি পুষ্করিণী। তীরে নারিকেল, সুপারি, আম, জাম, কাঁটালের বাগান। চতুর্দ্দিকে শ্যামল-শ্রী। সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। একটা কোকিল কোথায় যেন ডাকিতেছে। সরসর করিয়া একটা গিরগিটি শুষ্ক পত্রগুলিকে সচকিত করিয়া সরিয়া গেল।

পুষ্করিণীর অপর পাড়ে একটি জীর্ণ দেবালয়—বুড়া শিবের মন্দির। সেখান হইতে ধূপধুনার গন্ধে সন্ধ্যার বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত।

ঘাটে স্নানার্থিনীর দল। সমস্ত দিন উপবাসের পর জননীগণ সন্তানের মঙ্গলকামনায় শিবের পূজা করিতে আসিয়াছেন। নীলষষ্ঠী।

প্রত্যেক জননীর মুখে, চোখে, আচারে, অবয়বে একই ভাষা ফুটিয়া উঠিতেছে, সন্তানের যেন কোন অনিষ্ট না হয়—"হে দেবতা, হে শঙ্কর, আমার ছেলেদের সুখে রাখিও।"

ভাবিতেছি, এই জননীও প্রয়োজন হইলে সন্তানহত্যা করে।

পৃথিবীতে প্রয়োজনের তাগিদে শিবপূজাও করে, শিশুহত্যাও করে। ভাবিয়া দেখিতেছি, এ জগতে প্রয়োজনের দাবিটাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দাবি। দয়া, মায়া, বিবেক, নীতি সমস্ত গুঁড়া করিয়া দিয়া প্রয়োজনের এই লৌহ-'রোলার'টা দুনিয়ার রাজপথ দিয়া সগর্জ্জনে চলিয়াছে। ইহার চাপে মা-ও ছেলের গলা টিপিয়া ধরে। স্বামী স্ত্রীকে অপরের—

"আমার দড়িটা ফিরিয়ে দাও।"

চমকিয়া দেখিলাম, আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে একটি বৃদ্ধা চাহিয়া আছে। মুখের চামড়া বলিরেখাঙ্কিত—কুঁচকাইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মাথাটা জরাভারে কাঁপিতেছে। মাথার চুলগুলা শ্বেত নয়, পীতবর্ণ। নিষ্প্রভ চক্ষুর দৃষ্টিটা আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বৃদ্ধা আবার বলিল—

"ফিরিয়ে দাও আমার দড়িটা, ফিরিয়ে দাও। আমার গলার দড়ি কেন তুমি খুলে দিয়েছিলে? কোথা রেখেছ সেটা, দাও। আবার আমি গলায় দড়ি দেব। আমার নিশ্চয় এখনও ভাল ক'রে মরা হয় নি। আমার সব মনে পড়ছে, সমস্ত মনে পড়ছে।"

বলিয়া বৃদ্ধা বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

"একে কি মরা বলে? নিশ্চয় আমি বেঁচে আছি এখনও। আমার হাতটা দেখ তো ডাক্তারবাবু, বোধ হয় আমি বেঁচে আছি। আমার সব মনে পড়ছে যে! দেখ তো—"

বৃদ্ধা তাহার কম্পিত দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া আরও খানিকটা আগাইয়া আসিল।

"দাও আমার দড়ি ফিরিয়ে, আমি ঠিক বেঁচে আছি। না, বেঁচে থাকতে আমি পারব না, পারব না, আমি পারব না। আমায় আবার মেরে ফেল তুমি।"

"তুমি তো ম'রে গেছ। প্রায় এক মাস আগে।"

"মিছে কথা। এক মাস আগে আমি মরবার জন্যে গলায় দড়ি দিয়েছিলাম, কিন্তু মৃত্যু আমার হয় নি। আমার সব মনে পড়ছে যে! আমার গলার দড়ি তুমি খুলে দিয়েছিলে।"

চুপ করিয়া রহিলাম।

ভ্রূকুটি করিয়া তীব্রস্বরে বৃদ্ধা প্রশ্ন করিল—"খুলে দাও নি তুমি?"

"দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার মৃত্যুর পর।"

"আমার সব মনে পড়ছে কেন?"

"কি মনে পড়ছে?"

"উঃ, মর্ম্মান্তিক সে কথা! পটাপট সে আমার মুখে জুতো মেরে গেল। চুলের ঝুঁটি ধ'রে উঠোনে ফেলে পেটে লাথির পর লাথি মারলে, আমার বুকের পাঁজরার হাড় গুঁড়িয়ে গেল তার লাথির চোটে,—এই দেখ।"

যে স্থানটা চিরিয়া ভগ্ন অস্থিটি পরীক্ষা করিয়াছিলাম, বৃদ্ধা সেই ক্ষতস্থানটা দেখাইল।

"আমি আবার মরব। সত্যি বলছি ডাক্তারবাবু, আবার

আমাকে মরতে হবে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি ডাক্তারবাবু, আমায় মেরে ফেলো তুমি।”

তাহার গণ্ড বাহিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িল।

“মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু কে জান? নিজের পেটের ছেলে। এত বড় শত্রু আর হয় না। বিশেষত সে যদি আমার মত বিধবার একমাত্র সন্তান হয়। শত্রু—শত্রু—দারুণ শত্রু। গর্ভে যতদিন ছিল আমার রক্ত শোষণ করেছে। ভূমিষ্ঠ হবার পরও তার শোষণ বন্ধ হয় নি। চোঁ-চোঁ ক'রে শতমুখে সে আমার রক্ত শুষেছে। দেহের রক্ত থেকেই না দুধ হয়? সেই দুধ সে আট বছর ধ'রে খেয়েছে। শুনেছেন কখনও, আট বছরের ছেলে মাই খায়? কত ঠাকুর-দেবতার দোর ধ'রে, কত মানত পুজো ক'রে যে এই ছেলেকে মানুষ করেছি! একটা ষষ্ঠী কখনও বাদ দিই নি, উপোসে উপোসে শরীর শীর্ণ হয়ে গেছে আমার।”

চকিতের মধ্যে আমার মনে সেই পুষ্করিণী-তীরের নীলষষ্ঠীর ছবিটা আবার ভাসিয়া আসিল। দেখিলাম, সবুজ গাছগুলিতে আগুন লাগিয়াছে—গগনস্পর্শী অনলশিখা দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে। অস্তগামী সূর্য্যের সে দীপ্তি আর নাই, যেন একটা অঙ্গারখণ্ড। কোকিলটা দেখিতে দেখিতে শকুনি হইয়া গেল। পুষ্করিণীর জল রক্তে রূপান্তরিত হইয়াছে। তাহাতে শত শত লোলুপ কুম্ভীর একে একে আসিয়া জননীদের গ্রাস করিতেছে।

জননীর আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক মুখরিত। জীর্ণ শিবমন্দিরে বসিয়া আছে—শিব নয়, একটা বিকট রাক্ষস, জননীদের দুর্দ্দশা দেখিয়া হা-হা করিয়া হাসিতেছে।

"একমাত্র ছেলে আমার। কত কষ্ট ক'রে যে মানুষ করেছি! যখন সে যা চেয়েছে, তাই দিয়েছি। তার আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্যে আমার যা কিছু ছিল, সব গেছে। শুনেছ কখনও তেরো বছরের ছেলে হাতে রুপোর হাত-ঘড়ি বেঁধে ইস্কুল যায়? শুনেছ কখনও, যে ছেলে একটাও পাস করতে পারে নি, তার রোজ রোজ নতুন পোশাক চাই? কত রঙের কত ধরনের পাঞ্জাবি যে তার কিনে দিয়েছি! কত রকমের জুতো, কত রকমের ছড়ি! গ্রামের ইস্কুলে তার পড়তে মন হ'ল না। শহরে গেল। কত কষ্টে যে তার খরচ যুগিয়েছি! আমার কষ্ট তুমি বুঝবে না ডাক্তারবাবু, মায়ের কষ্ট তুমি বুঝতে পারবে না। নিজের পেটের ছেলে যখন মদ খেয়ে এসে জুতো মারে, তখন মায়ের মনে কি যে হয়, তা বোঝবার তোমার ক্ষমতা নেই। সে তুমি বুঝতে পারবে না, সে তুমি বুঝতে পারবে না—দড়িটা আমার ফিরিয়ে দাও।"

কাহাকে দড়ি ফিরাইয়া দিব?

কোথায় গেল সে?

বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিলাম, চতুর্দ্দিক মেঘাচ্ছন্ন। কেবল সামান্য একটু আকাশ এখনও নির্ম্মেঘ রহিয়াছে। তাহাতে

জ্বলজ্বল করিয়া একটা তারা জ্বলিতেছে। সমুদ্রের মধ্যে যেন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে আলো জ্বলিতেছে। কোন্ পথহারা পথিককে ও পথ দেখাইতেছে? ওই মেঘের সমুদ্রে কি কোন নাবিক আছে? থাকিলেও কি তাহার পথ হারায়? পথ হারাইলে কি ওই তারার আলোয় সে পথ পাইবে? তারার আলোয় কি পথ হারায় না?

কিন্তু কি সুন্দর—কি উজ্জ্বল ওই তারাটি! আর্দ্রা নক্ষত্র কি? পুঞ্জীভূত এই তমিস্রার মধ্যে ওই একক নক্ষত্রটি দেখিয়া ভরসা হয়। মনে হয়, সমস্ত কালো নয়, আলোও আছে। মনে ধীরে ধীরে আশার সঞ্চার···। দেখিতে দেখিতে নির্ম্মেঘ আকাশ-টুকুও মেঘে ঢাকিয়া গেল। নক্ষত্র ঢাকা পড়িল। মেঘের গুরু গুরু গর্জ্জনে অন্ধকার শিহরিয়া উঠিল।···ভাবিতেছি, আকাশ যাহার সৃষ্টি, মেঘও কি তাহারই সৃষ্টি? আলো এবং অন্ধকার কি একই কবির কবিতা? পাপ এবং পুণ্য? সত্য এবং মিথ্যা?

"সত্য-মিথ্যার সৃষ্টিকর্ত্তা আমরাই। ম'রে সেটা বুঝতে পেরেছি। আমাকে একটু জল দিতে পারেন? বড় জ্বালা। আগুনটা এখনও যেন নেবে নি।"

একটি উলঙ্গ অর্দ্ধদগ্ধ নারী দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার পেট, বুক এবং পায়ের খানিকটা পোড়া। পেটের ও বুকের স্থানে স্থানে ছাল উঠিয়া গিয়া লাল মাংস বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে বড় বড় ফোস্কা।

এত দুঃখেও কিন্তু সে হাসিতেছে। এক পিঠ চুল। কালো মুখটিতে বড় বড় চোখ দুইটি বেদনাতুর; তবু যেন কৌতুকদীপ্ত।

"দিন না একটু জল। জ্বালা কমে নি এখনও—উঃ, বড় জ্বালা! ম'রে গেছি, তবু জ্বালা কমে না কেন বলুন তো?"

কাঁদিতে কাঁদিতেও মেয়েটি যেন হাসিতেছে। হাসি-কান্না যেন মেঘ ও রৌদ্রের মত তাহার মুখে আসা-যাওয়া করিতেছে। কালো, কিন্তু কি চমৎকার মুখশ্রী? হঠাৎ মনে হইল, এ কি সেই মেয়েটি, যাহার কথা কবি—

সেই মেয়েটি হাসিয়া বলিল—"কি ভাবছেন বলব?"

"কি?"

"সেই কবির কথা। সে এসেছিল বুঝি আপনার কাছে? বেচারা! তার সব গল্প বিশ্বাস করেছেন আপনি? কবিতা শুনিয়েছে সে আপনাকে? বেশ কবিতা, নয়?"

তাহার বড় বড় কৌতুকভরা সজল চক্ষু দুইটি আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল।

"বেচারা আসল কথাটা যদি জানত! ভুলটা তার কোন-দিন ভেঙে দিই নি। আমার স্বার্থ ছিল কিনা! এখন দেখা পেলে ভেঙে দিতাম। যদি যে আসে, তার ভুলটা ভেঙে দেবেন আপনি?"

"কি ভুল?"

"একদিনের জন্যও তাকে আমি ভালবাসি নি। কবিতা-টবিতা আমার মোটে ভাল লাগে না। আমার মনে হয়, ওসব

ন্যাকামি। হয়তো আমি বুঝতে পারি না। তাই ব'লে ভাববেন না যে, আমি আমার স্বামীকেই ভালবাসতাম। স্বামীকে আমি মোটে দেখতে পারতাম না। আমার স্বামী রক্তমাংসের শক্ত মানুষ ছিল না। যেমন লিকলিকে তার দেহ—তেমনই লিকলিকে তার মন। তার দেহ বা মনে এতটুকু শক্তির সন্ধান কখনও দেখতে পাই নি। সে যদি শক্ত সমর্থ বর্ব্বর একটা দস্যুও হ'ত, তা হ'লেও আমি ঢের বেশি সুখী হতাম। এম. এ. ডিগ্রী নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব? না, এম. এ. পাস প্রফেসার স্বামীকে আমার মোটে পছন্দ হয় নি। আমার একটা গল্প শুনবেন? গল্প নয়, সত্যি কথা। যখন বেঁচে ছিলাম, তখন নিজের কাছেই কথাটা স্বীকার করতে লজ্জা হ'ত। এখন আর লজ্জা কি, ভয়ই বা কি?"

আর একটু কাছে সরিয়া আসিল।

"আমাদের বাড়ির পাশে একটা ছোটলোক থাকত, বুঝলেন, ছোটলোক মানে গরিব লোক। আমাদের বাড়ির জানলা থেকে তাদের বাড়ির উঠোন দেখা যেত। কি ষণ্ডা লোকটা—মাথায় বাবরি-চুল, প্রকাণ্ড গোঁফ, গালপাট্টা-দাড়ি। দেখলে মনে হ'ত, যেন যমদূত। সে রোজ এসে তার বউটাকে চুলের ঝুঁটি ধ'রে ঠেঙাত। বউটার কান্নার জ্বালায় পাড়ার সবাই অস্থির হয়ে উঠতাম। এক-একদিন আবার সেই লোকটা বউটাকে আদরও করত দেখতে পেতাম। অত অজস্র আদর করতেও কাউকে দেখি নি কখনও। অত সোহাগ কোন পুরুষ

যে কোন স্ত্রীকে করতে পারে, তা আমার ধারণার অতীত ছিল। সত্যি বলছি, সেই বউটাকে দেখে আমার হিংসে হ'ত। আহা-হা, অমন সুন্দর প্রজাপতিটা পুড়ে গেল, দেখুন !"

দেখিলাম, সেই রঙিন প্রজাপতিটা দীপশিখায় পড়িয়া সত্যই পুড়িতেছে। একটা ডানা পুড়িয়া গিয়াছে, ছটফট করিতেছে। শুনিতে পাইলাম, সে যেন বলিতেছে—"যত হীন তোমাকে মনে করিয়াছিলাম, তত হীন তুমি নও, তুমি বন্দিনী, তবু তুমি সুন্দরী।"

পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গেল। একটা বিকট গন্ধে চতুর্দ্দিক ভরিয়া উঠিল। দীপশিখা দেখিলাম হাসিতেছে।

বিশ্বের সমস্ত নিস্তব্ধতা যেন ঘরটাতে ঘনাইয়া আসিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই।

হঠাৎ সেই মেয়েটি আবার কথা কহিল—

"ভাল আমিও বেসেছিলাম। কাকে জানেন ? ওই কবিরই একটি ভাই ছিল, তাকে। সুন্দর ছেলে। সে কবিতাও লিখত না, লেখাপড়াও বেশি জানত না। কিন্তু চমৎকার ছেলে, কি তার স্বাস্থ্য, কত বলিষ্ঠ তার মন ! বেশি কথা বলত না। নিজের পড়াশোনা নিয়েই থাকত। বি. এ. না কি পড়ত, তখনও তার লেখাপড়া শেষ হয় নি। বীরেন তার নাম। কবির কাছে কবিতা শোনবার ছুতোয় যেতাম তাকেই দেখতে। কবি মনে করত, আমি বুঝি তারই প্রেমে প'ড়ে গেছি। কবিতা শুনে

মুগ্ধ হয়েছি, তাই নানা ছুতোয় রোজ যাই। কি ভীষণ অহঙ্কারী এই কবিরা!”

বলিয়া মেয়েটি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

“আমি যেতাম বীরেনকে দেখতে, কত মিথ্যেই যে সত্যের মুখোশ পরে! কবি ছিলেন আমার স্বামীর বন্ধু। একটা বড় বাড়ির দুটি বিভিন্ন অংশে থাকতাম আমরা। কবির বাড়িতে আমার অবাধ যাতায়াত ছিল। তাই ব'লে ভাববেন না যে, স্বামী আমার উদারমতাবলম্বী ছিলেন। একেবারেই তা নয়। সাহস ক'রে বারণ করবার মত বলিষ্ঠতা তাঁর ছিল না। তাঁর দুর্ব্বলতার এই সুযোগ নিয়ে আমি যখন খুশি ওদের বাড়ি চ'লে যেতাম। আর একটা সুযোগও ছিল। কবির একজন বৃদ্ধা জ্যেঠাইমা ছিলেন বাড়ির কর্ত্রী। তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন। বার বার আমায় ডেকে পাঠাতেন, তাঁর কাছে যাওয়ার নাম ক'রে রোজ যেতাম সেখানে।”

কবি আমাকে একলা পেলেই কবিতা শোনাতেন। বুঝতাম, কবিতার মারফৎ প্রেম-নিবেদন করছেন। সব বুঝতাম, কিছু বলতাম না। বরং মুগ্ধ হবার ভান করতাম। ভান করতে আমরা কত পটু, তা জানেন তো?” বলিয়া মেয়েটি আবার ফিক করিয়া একটু হাসিল। তাহার পর বলিল—“উঃ, বড় জ্বালা করছে! সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল আমার! আগুনটা কি নেবে নি এখনও? একটু ব্যবস্থা করুন না!”

“গল্পটা আগে শেষ কর।”

"এ অসমাপ্ত গল্প। বীরেনকে আমি পাই নি তো। লোকে ঘেয়ো কুকুরকে যেমন দূর-দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়, সেও তেমনই ক'রে একদিন তাড়িয়ে দিলে আমাকে। একদিন মাত্র তাকে একা পেয়েছিলাম। পাঁচ মিনিটের জন্যে···মাত্র পাঁচ মিনিট, তাও বোধ হয় নয়। লজ্জার মাথা খেয়ে সেদিন তার কাছে সমস্ত মনখানা মেলে ধরেছিলাম। সে কি বললে, জানেন? 'দ্বিতীয় বার এ কথা আর আমার কাছে উচ্চারণ করবেন না। আমি জানতাম, আপনি ভাল। এ কি আপনার ব্যবহার, ছি ছি! বাড়ি যান।' এই ব'লে সে বেরিয়ে চ'লে গেল। বজ্রাহতের মত নির্ব্বাক হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হতে লাগল, যেন পায়ের তলা থেকে মাটি স'রে যাচ্ছে। আমার সমস্ত ইহকাল, সমস্ত সত্তা যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, সমস্ত বিশ্বভুবন যেন আমার চোখের সামনে দুলতে লাগল। ঠিক সেই সময় কবিও এলেন। তিনিও আমাকে একা পেলেন। তাঁর মানসী যে আমি ছাড়া আর কেউ নয়, এ কথা তিনিও এতকাল বলবার শুভযোগ খুঁজে পান নি। সেই স্নিগ্ধ সন্ধ্যার সুদুর্লভ নির্জ্জনতার নিবিড়তায়,—কি ছাই আমার ভাল মনেও নেই সেসব ভাষা। মোট কথা, তিনিও প্রেম-নিবেদন করলেন সেদিন। বীরেনের কথাগুলো আমার কানে বাজছিল। অবিকল সেই কথাগুলি আবৃত্তি ক'রে দিলাম।"

মেয়েটি আবার চুপ করিয়া গেল।

"কি হ'ল তারপর?"

"তারপর তো আপনি সব জানেন। কবি সেই দিন রাত্রেই রিভল্‌ভার দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। পরদিন আমিও পুড়ে মলাম। পুড়ে মরবার আগে অবশ্য স্বামীর সঙ্গে আমার ঝগড়া প্রায় রোজই যেমন হ'ত তেমনই হয়েছিল। পাড়ার লোকে জেনেছে, আমার মৃত্যুর কারণ আমার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া। আমার স্বামী বুঝলেন, মৃত্যুর কারণ কবির সঙ্গে প্রেম। কবির ধারণা হয়েছিল বোধ হয় যে, আমি তাকে ভালবাসতাম। কবির মৃত্যুর কারণ আপনারা ঠিক করেছিলেন বুঝি পাগলামি—টেম্‌পরারি ইন্‌স্যানিটি। বীরেন কি ভেবেছে সেই জানে। সত্য-মিথ্যার কেমন একটা হেঁয়ালি বলুন তো ?"

মেয়েটি হাসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। চক্ষু দুইটিতে কাতর মিনতি ফুটিয়া উঠিল আবার।

"উঃ, বড় জ্বালা! একটু কিছু করুন না, ডাক্তারবাবু। বড় জ্বালা!"

জীবিতের চিকিৎসা হয়তো কিছু জানি। মৃতের কি চিকিৎসা করিব ? শিখি নাই তো।

মূঢ়ের মত বসিয়া শুনিতেছি—"বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—"

ধীরে ধীরে আর্ত্তস্বর অন্ধকারে মৃদুতর হইয়া মিলাইয়া গেল।

বাতায়ন-পথে চাহিয়া বসিয়া আছি।

নীরন্ধ্র অন্ধকারকে চিরিয়া চিরিয়া সর্পাকৃতি বিদ্যুৎশিখা আকাশ ব্যাপিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। সামনের মাঠে কুলগাছটা যেন প্রেতিনীর মত দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মাথায় অসংখ্য জোনাকি। প্রেতিনীর সহস্র জ্বলন্ত চক্ষু যেন অন্ধকারে কাহাকে খুঁজিতেছে।

কাহাকে?

একটা দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকিল।

বইয়ের পাতাগুলা ফরফর করিয়া উড়িতে লাগিল। বইটা তুলিয়া লইয়া আবার গল্পে মন দিলাম।

"খুব সঙ্কীর্ণ পথ। দুই ধারে আকাশচুম্বী খাড়া উঁচু পাহাড়। গিরিসঙ্কটের ভিতর বেশ অন্ধকার। মেয়েটির চোখে মুখে একটা ভীত চকিত ভাব। রাত্রি আসবার আগে সে এই সঙ্কীর্ণ পথটুকু অতিক্রম ক'রে যেতে পারলে যেন বাঁচে। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মটাস ক'রে একটা গাছের ডাল ভাঙার শব্দ যেন শুনতে পেলাম। অন্ধকারে—প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে, কি যেন একটা দাঁড়িয়ে আছে মনে হ'ল। কি ওটা?

'ছুটে পালাও তুমি'—মেয়েটি মনে হ'ল বলছে। তার মুখ সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ডান হাত দিয়ে সে তার ছোট কুড়ুলের বাঁটটি চেপে ধরেছে।

শক্তি থাকলে হয়তো আমি ছুটে পালিয়েই আসতাম। কিন্তু আমি নড়তে পারলাম না। ভয়ে আমার পায়ের পেশীগুলো যেন অসাড় হয়ে গেল। চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে পাথরের মূর্তির

মত দাঁড়িয়ে রইলাম। এইবার সেই বস্তুটাকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম—শ্বেতভল্লুক। একটা ঝোপের ভেতর থেকে মুণ্ড আর সামনের পা দুটো বের ক'রে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। মুখে একগোছা 'বেরি'ফল। তার আহারে আমরা বিঘ্ন উৎপাদন করেছি। প্রকাণ্ড বড় ভাল্লুক। গায়ের লোম দেখলে মনে হয়, খুব বুড়ো।

'পালাও'—আমিও মেয়েটির কানে কানে বললাম। আমার মনে সহসা কেন জানি না একটা পৌরুষভাব জেগে উঠল। মনে হ'ল, মেয়েটি পালিয়ে যাক, আমি বুক দিয়ে ওকে আগলাব। ভালুকের সঙ্গে লড়তে হয় যদি, তাও স্বীকার। মনে মনে এই পুরুষোচিত সঙ্কল্প করলাম বটে, কিন্তু তখনও আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ। বৃহৎ পশুটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। মেয়েটি কিন্তু পালাল না। সে যা করলে, তাও কেউ যে কোনদিন করতে পারে, তা কখনও কল্পনা করি নি। সে না পালিয়ে ভালুকটার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে সে তার অঙ্গচ্ছদ খুলে ফেললে। খুলে ফেলে সে আঙুল দিয়ে তার 'ব্রিচেস' ভালুকটাকে দেখাতে লাগল, এই রকম চওড়া 'ব্রিচেস' মেয়েরা পরে। অর্থাৎ সে যে নারী এই কথাটি সে ভালুককে বোঝাবার চেষ্টা করলে। ভালুকটা একবার চেয়ে দেখলে, ফলের গোছাটা মুখ থেকে তার প'ড়ে গেল। নাসারন্ধ্র থেকে বার দুয়েক ফোঁস ফোঁস আওয়াজ ক'রে জঙ্গলের নিবিড়তায় দেখলাম সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর ফিরে এল না।

ল্যাপদের ধারণা, শ্বেতভল্লুক মেয়েদের কিছু বলে না—"

"আমরা কিন্তু শ্বেতভল্লুক নই, আমরা মানুষ। নারীমাংসে আমাদের অরুচি নেই।"

"কে?"

চমকাইয়া উঠিলাম।

একটা মুণ্ড শূন্যে ঝুলিতেছে। পুরু পুরু ঠোঁট দুইটিতে পাশবিক একটা হাসি। মাথার চুলগুলো খোঁচা খোঁচা এবং খাড়া। মুখের গোঁফ-দাড়িও সেইরূপ। একটা সজারু যেন সর্ব্বাঙ্গের কাঁটাগুলাকে উদ্যত করিয়া শূন্যে ঝুলিয়া আছে।

"নারীমাংস আমার ভারি প্রিয় জিনিস ছিল। অভাবও কোনদিন হয় নি। বাবা প্রচুর টাকা রেখে গিয়েছিলেন। বাদ সাধল কিন্তু বিবেক। এই বিবেকের টুঁটি চেপে ধরবার জন্যে কি কম আয়োজন করেছিলাম? মোসায়েব, মদ, আফিং, গাঁজা, কোকেন, যত রকম হতে পারে। কিন্তু পারলাম না। বিবেককে হত্যা করতে পারলাম না। বিবেকই আমাকে হত্যা করলে। আচ্ছা, ডাক্তার, হত্যা করলে মানুষের ফাঁসি হয়, বিবেকের ফাঁসি হয় না? বিবেকের প্ররোচনায় কত হত্যাকাণ্ড রোজ হয় জান? অনেক···এক-আধটা নয়, অনেক। অথচ এই বিবেককে কেউ শাস্তি দেয় না, কেমন তোমাদের আইন?"

লোকটা স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিয়া হাসিয়া উঠিল—"আইনের দোষ কি? বিবেককে তো আর ধরা যায় না। তার হাতে হাতকড়ি লাগাবারও উপায় নেই। আশ্চর্য্য

অশরীরী জিনিস এই বিবেক! অথচ কি ভয়ঙ্কর! আমার ঘাড় ধ'রে নিয়ে গিয়ে রেল-লাইনের ওপর মুখটা গুঁজড়ে ধ'রে রেখে দিলে, যতক্ষণ না বম্বে-মেলটা আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে চ'লে গেল। কিছুতে নড়তে পারলাম না আমি। আচ্ছা, ডাক্তার, আমার ধড়টা কোথা গেল বলতে পার? ধড়টা না হ'লে যে চলছে না!"

কাটা মুণ্ড আবার শূন্যে মিলাইয়া গেল। মনে হইল, দেওয়ালের ওই ক্যালেণ্ডারখানার পাশে অন্তর্হিত হইল।

সামান্য একটা ক্যালেণ্ডার।

তাহারই দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি। ক্যালেণ্ডারের ছবিটাকে এত ভাল করিয়া আর কোনদিন দেখি নাই। ছায়া-মুণ্ডটা উহার পাশ দিয়া মিলাইয়া গেল, তাই ছবিটার দিকে নজর পড়িল। অগ্রাহ্য করিবার মত ছবি তো নয়। রূপদক্ষ শিল্পীর অন্তরের সৌন্দর্য্যবোধ তুলির টানে টানে যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। নীলাম্বরী শাড়ির আবেষ্টনীতে সুন্দর মুখখানি অপরূপ। এতকাল ধরিয়া সম্মুখে টাঙানো আছে, লক্ষ্যই করি নাই। আশ্চর্য্য!

মানুষের জীবনে সব সময়ে সব জিনিস লক্ষ্য করিবার সুযোগ আসে না। মানুষ এক সময় একটা জিনিস লইয়াই মাতিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাকি জিনিসগুলার সহিত সে বাহ্যিক লৌকিকতা রক্ষা করে মাত্র। অন্তর দিয়া একই কালে সমস্ত জিনিসের সত্তাকে সে সমান আগ্রহে অনুভব করে না। করিতে

পারে না। ইহা তাহার ক্ষমতা ও অক্ষমতা। ফুলকে যখন দেখি, পাখীর কথা বিস্মৃত হই।

চিত্রার্পিতা সুন্দরী একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া আছে। ভাবিতেছি, ছবি কি ভালবাসে? আমাদের মত উহার বুকেও কি সুখ-দুঃখের দোলা লাগে? লাগিলেও কি আমাদের মত বিচলিত হয়? ছবি কি কখনও কাঁদে? হয়তো কাঁদে। আমরা দেখিতে পাই না। ছবির ক্রন্দনের ভাষা হয়তো অশ্রু নয়, আর কিছু। জড় ও চেতনের মধ্যে সত্যই কি কোনও তফাত আছে? এই নিখিল বিশ্বের বিরাট বস্তুপ্রবাহের মধ্যে কে জড় কে চেতন কে ঠিক করিয়া দিবে? সীমারেখা কোথায়? সীমা বলিয়া কিছু আছে কি? সীমা যদি কিছু থাকে, তবে তাহা আমাদের বুদ্ধির। আমাদের নিজেদের বুদ্ধি সীমাবদ্ধ বলিয়া আমরা প্রত্যেক জিনিসের সীমা-নির্দ্দিষ্ট করিতে চাই। সীমা না পাইলে আমরা অসীমের কল্পনা করিতে পারি না। গণ্ডির ভিতর আছি বলিয়াই ভূমার কল্পনা করি। ভূমার কল্পনা করি, কিন্তু গণ্ডি রচনা করিতেও ছাড়ি না। সারাজীবন নানা ভাবে গণ্ডির পর গণ্ডি রচনা করিয়া চলিয়াছি। তাহাতেই আমাদের তৃপ্তি। অথচ একটু ভাবিয়া দেখিলেই সমস্ত সীমা বিলুপ্ত হইয়া যায়, চেতন জড় হয়—জড়ের চেতনা জাগিয়া উঠে। সমস্ত গণ্ডি মুছিয়া যায়। জীবন ও মরণের ব্যবধান আর থাকে না।...

মনে হইল, ছবির চোখের যেন পলক পড়িল। পীবর বক্ষটি

যেন তুলিয়া উঠিল, দীর্ঘনিশ্বাস মোচনের শব্দ যেন পাইলাম। মনে হইতেছে, এইবার যেন কথা কহিবে।···একা অন্ধকার রজনীর নিঃসঙ্গতার মধ্যে ওই ক্যালেণ্ডারের ছবিখানিকে অত্যন্ত নিকট-আত্মীয় বলিয়া মনে হইতেছে। ইচ্ছা করিতেছে, উহাকে ডাকিয়া বলি—"হে সুন্দরী, রেখার বন্ধনে কে তোমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে? তুমি প্রাণময়ী হও, সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও। প্রমাণ করিয়া দাও যে, জড় ও চেতনার কোনও প্রভেদ নাই।"

সহসা এক ফালি জ্যোৎস্না আসিয়া বাতায়ন-পথে প্রবেশ করিল। চাহিয়া দেখিলাম, মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীয়মাণ চন্দ্র উঠিতেছে। মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম, আশেপাশে এখনও কালো কালো মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

মনে হইল, যেন ওই কৃষ্ণপক্ষের ম্রিয়মাণ চন্দ্রকলার মুখে একটা বেদনার হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুদূর আকাশ হইতে মনে হইল তাহার কথা আমি শুনিতে পাইতেছি—

"আমাকে দেখিয়া অত মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া আছ কেন? এখন তো আমার মধ্যে মুগ্ধ হইবার মত কিছু নাই। একদিন ছিল বটে, যখন আমার পর্ব্বতের শিখরে শিখরে আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত মহিমা প্রধূমিত হইয়া উঠিত, প্রতি পরমাণুতে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিতাম, প্রদীপ্ত জ্বালায় নিজের কক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে একদা আমিও আকাশের দীপালীতে আমার অন্তরদীপটিকে সগৌরবে তুলিয়া ধরিয়াছিলাম, আজ কিন্তু আমার কিছু নাই!

এখন আমি নিবিয়া গিয়াছি। এখন আমি আমার পূর্ব্ব-গৌরবের কঙ্কাল মাত্র। মহাকাশে প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। জীবন্ত সূর্য্যের করুণা-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া এই যে আমার প্রকাশ, ইহাতে আমার গৌরবের কিছুই নাই। আমি মৃত, আমি প্রেতাত্মা।"

মেঘ আসিয়া কৃষ্ণ যবনিকা টানিয়া দিল। চন্দ্রমা অবলুপ্ত হইল।

একটা ভেকের আর্ত্তস্বর অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিতেছে। তাপে ধরিয়াছে। কোঁক-কোঁক-কোঁক—একটানা একঘেয়ে শব্দ একটা—সুর আছে, তালও আছে।

সঙ্গীত ?

মনে হইল, যেন একখানা অতি শীতল হস্ত আমার কাঁধের উপর কে রাখিয়াছে! ফিরিয়া দেখি, একটি মেয়ে। কিশোরী, যুবতী, কি বৃদ্ধা বুঝিবার উপায় নাই। একদা হয়তো পরমা সুন্দরী ছিল, জানি না, এখন বীভৎস। সমস্ত মুখখানা ফুলিয়া পচিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে মাংস নাই। বিদীর্ণ স্ফীত উদরটা হইতে পচা অন্ত্রগুলা বাহিরে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বিগলিত ...ন চক্ষু দুইটি নিষ্পলক।

কোথা গেল সে? কোথায় হারিয়ে গেল? আমরা যে একসঙ্গে জলে ডুবেছিলাম, আর তো তাকে দেখতে পাচ্ছি না! কোথায় গেল? ম'রেও কি তাকে পাব না? তাকে যে আমি

চাই। ওগো, কে তুমি, খুঁজে দাও না তাকে, আমি খুঁজে পাচ্ছি না যে'! চারিদিকে এ কি অন্ধকার—"

হাতড়াইতে হাতড়াইতে মেয়েটি অন্ধকারে ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া গেল। চক্ষু দুইটিতে অন্ধের অর্থহীন দৃষ্টি।

মুখে হাত চাপা দিয়া কে যেন খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখি, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে তাকাইয়া আছেন। মুখটা রক্তহীন, ফ্যাকাশে।

"ভুল ভাবছেন আপনি। সব আত্মহত্যার কারণ প্রেম নয়। আমি প্রেমে প'ড়ে মরি নি। আমি মরেছি আপন খুশিতে—সজ্ঞানে এবং বহাল তবিয়েতে। তাই ব'লে ভাববেন না যে, জীবনে কখনও প্রেমে পড়ি নি। অনেকবার পড়েছি। পড়েছি এবং উঠেছি। কিন্তু আত্মহত্যা করবার প্রয়োজন কোনদিন অনুভব করি নি।"

বলিয়া ভদ্রলোক পিছন দিকে দুই হাত দিয়া শিস দিতে দিতে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভাবটা যেন—আত্মহত্যা করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাতে এমন আর কি হইয়াছে, যাহা লইয়া ক্রমাগত কবিত্ব করিতে হইবে!

হঠাৎ আমার কাছে আসিয়া আবার তিনি বলিলেন—

"ব্যথা, অভিমান কিছুই নয়। বিদ্রোহ। জীবনে কখনও কোন ব্যাপারে হার মানি নি। এম. এ. পর্য্যন্ত সব পরীক্ষায় বরাবর ফার্স্ট হয়েছি। শুধু পড়াশোনাতেই নয়, খেলাতেও ফার্স্ট। এমন কি তাস-খেলাতেও।"

বলিয়া ভদ্রলোক আমার দিকে চোখ বড় বড় করিয়া চাহিলেন।

"প্রেমের ব্যাপারেও চিরকাল জিতেছি। পেটের জন্যেও কারও কাছে হাত পাতবার দরকার হয় নি। 'ব্যাচিলর' মানুষ, আনন্দেই ছিলাম। হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখি— কি দেখলাম বলুন তো?"

সকৌতুকে আমার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"না না, ব্যাঙ্ক ফেল নয়। সকালে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, দু-একগাছা চুল পেকেছে। সমস্ত সকালটা মন খারাপ হয়ে রইল। খবরের কাগজে মন দিতে পারলাম না। বন্ধুরা এলেন। আলাপ জমল না।"

দিনটা এক রকম কাটল। রাত্রে কিন্তু ওই পাকা চুল দুটো বড় জ্বালাতন করতে লাগল। যেই একটু ঘুম আসে, অমনই মনে হয়, যেন মাথার পাকা চুল দুটো সাদা সাদা প্রেতমূর্ত্তির মত সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলছে, ওহে ভাগ্যবান ধনীর দুলাল, এইবার তো সময় হ'ল। এইবার হার মানতে হবে। আর দেরি নেই। ঘুম হ'ল না। এমনই প্রায় রোজ। আমাদের বাড়ির পাশে একজন থুড়থুড়ে বুড়ো থাকত। একদিন স্বপ্নে দেখলাম, সে যেন বলছে, 'কি হে ছোকরা, ভারি যে আমাকে অনুকম্পা করতে! এইবার?' বলছে আর হাসছে।"

ভদ্রলোক চুপ করিলেন।

"বুড়োটা সত্যিই সকলের কৃপা-পাত্র ছিল। মুখে একটি দাঁত ছিল না। চোখে দেখতে পেত না। উপযুক্ত ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতিনী সবাই একে একে চোখের সামনে ম'রে গেল বুড়োর কিন্তু মৃত্যু নেই। মহাকাল যেন চাবকাচ্ছে তাকে ধ'রে।

আমারও মনে হ'ল, এই তো আমারও 'নোটিস' এসে গেছে এইবার কোন্‌দিন এসে চুলের মুঠিটা ধরবে। তারপর শুরু হবে টানাটানি। এক দিকে ধরবে আত্মীয়-স্বজনরা, আর এক দিকে যমদূতরা। সেই টানাটানির মধ্যে দারুণ যন্ত্রণায় প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। অসহ্য! সে চিন্তাও অসহ্য! শেষকালে জরার কাছে পরাভব স্বীকার করব? কেন স্বীকার করব—রিভল্‌ভার থাকতে?...ভাল করি নি?"

হাসিমুখে ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন।

"মাথায় গুলি করি নি। তার কারণ, আমার এমন সুন্দর চেহারাটা নষ্ট করতে মায়া হ'ল। আচ্ছা, দেখুন তো ডাক্তার-বাবু, আমার মুখের চেহারা ঠিক আছে তো?"

ভদ্রলোক স্মিত মুখে নিজের মুখটা তুলিয়া ধরিলেন। তাহার পর কোটের বোতামগুলি ধীরে ধীরে খুলিয়া তিনি দুই হাত দিয়া কোটটা ফাঁক করিয়া বলিলেন—

"এই দেখুন, মহাকালের ওপর টেক্কা দিয়েছি।"

দেখিলাম, বুকে ঠিক হার্টের উপর নিদারুণ ক্ষতটা। মনে হইল, ক্ষতটাও যেন হাসিতেছে।

ভদ্রলোক কোটের বোতামগুলি লাগাইয়া বলিলেন—"এত

সহজে মরেছিলাম, তার কারণ বোধ হয় পৃথিবীতে আমাকে বেঁধে রাখবার মত কেউ ছিল না। বাবা-মা ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিলেন। সুখের পারাবতের মত কতকগুলি বান্ধব-বান্ধবী এসে চারিদিকে বকবকম করতেন বটে; কিন্তু তাঁদের আকর্ষণ এত শক্ত ছিল না, যার খাতিরে জরার অত্যাচার সহ্য করা যায়।"

বলিয়া ভদ্রলোক নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছে।

"ওটা আপনার ভুল ধারণা। সব মৃত্যুর কারণ প্রেম নয়, অপ্রেমও হতে পারে। জীবনে আমার কোন বন্ধন ছিল না, তাই সহজে মরেছি।"

ভদ্রলোক আবার একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ মনে হইল, তাঁহার চোখে কি যেন চকচক করিতেছে! অশ্রু নাকি? ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বে ছায়ামূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।

মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, ক্যালেণ্ডারের মেয়েটি হাসিতেছে।

বাতায়ন-পথে চাহিয়া বসিয়া আছি।

আকাশের আবার রূপ বদলাইয়াছে। পুঞ্জীভূত মেঘ বিদীর্ণ করিয়া আবার চাঁদ উঠিতেছে। প্রকাণ্ড একখানা নিকষকৃষ্ণ মেঘ চৌচির হইয়া ফাটিয়া গিয়াছে। সেই ফাটল দিয়া অবিরল-ধারে জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িতেছে।

সৃষ্টি জুড়িয়া আলো ও আঁধারের এই চিরন্তন লীলা। সৃষ্টির

প্রারম্ভ হইতে আছে, শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে। রৌদ্রে, জ্যোৎস্নায়, ইন্দ্রধনুতে, বর্ণালঙ্কৃত মেঘমালায় ঋতুতে ঋতুতে আলো-আঁধারের যুগলরূপ নানা বেশে রূপায়িত হইয়া আছে। ইহাদের বিরহ-মিলনের অনবদ্য প্রকাশে দশ দিক সুরঞ্জিত।

আঁধার-বিরহিত আলোক সমস্ত দিনের তীব্র রৌদ্রদাহে কামনা করে স্নিগ্ধ অন্ধকারকে। দিবসের এই আঁধার-কামনা মূর্ত্ত হয় ঘনকৃষ্ণ মেঘমালায়, গভীর জলরাশির ঘন নীল কান্তিতে, অরণ্যের ছায়ার স্নিগ্ধতায়। আলোক-বিরহিত গাঢ় অন্ধকার রাত্রির নির্জ্জনতায় ধ্যান করে আলোকের শুভ্র মূর্ত্তি। অন্ধকারের আলোক-স্বপ্ন মূর্ত্ত হয় লক্ষ কোটি নক্ষত্রে, জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আবেশে, অনন্ত-প্রসারিত শুভ্র ছায়াপথে।

হঠাৎ মনে হইল, আকাশের গায়ে যেন কবির মুখখানা ফুটিয়া উঠিল। ওই বিদীর্ণ মেঘখানা যেন তাহার বিদীর্ণ মাথাটা, জ্যোৎস্নাধারা—যেন তাহার বিগলিত মস্তিষ্ক গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। মনে হইল, সমস্ত আকাশ, সমস্ত অন্ধকার পরিপূর্ণ করিয়া কবির গম্ভীর স্বর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল—

“গভীর বিরহ মাঝে কত যে মাধুরী আছে,
তৃপ্ত ও অতৃপ্ত কত সাধ!
কত সত্য, কত ভ্রান্তি কত জ্বালা, কত শান্তি,
কত তীব্র হরষ-বিষাদ!

কে বুঝিবে তার মূল্য ? কিবা আছে তার তুল্য ?
বুঝিবে না—চাহি না বুঝাতে,
চাহি না আনিতে টানি কাহারও সান্ত্বনা-বাণী,
এই অশ্রু হবে না মুছাতে।
ভরি সর্ব্ব চেতনারে অন্তরে বেদনারে
স্নেহভরে করিব লালন।
বেদনাই প্রিয়তম চিত্ত ভরি থাক মম,
চাহি না তা করিতে ক্ষালন।”

অকস্মাৎ বাতাসের বেগ বাড়িয়া উঠিল।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো কালো মেঘের দল চতুর্দ্দিক হইতে দানবের মত ছুটিয়া আসিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিল। সোঁ—সোঁ—সোঁ—সোঁ। অন্ধকারের বক্ষ হইতে যেন লক্ষ লক্ষ কালনাগিনী জাগিয়া উঠিয়াছে।···চাঁদ ঢাকা পড়িয়া গেল। কবি ও তাহার কবিতা ঝড়ের বেগে কোথায় উড়িয়া চলিয়া গেল। উন্মত্ত বাতাস ঘরে প্রবেশ করিয়া তাণ্ডব-নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে।···টেবিল হইতে একখানা খাম উড়িয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।···ক্যালেণ্ডারের হাস্যমুখী তন্বীর অধরে আর হাসি নাই।

সে ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া একটা ক্রন্দন গুমরিয়া উঠিল।

"ডাক্তারবাবু, সেই ছেলেটি কি আর এসেছিল?"

সেই সুন্দরী বারাঙ্গনাটি আসিয়াছে। জীবনে কাহাকেও ভালবাসিতে পারে নাই বলিয়া গলায় দড়ি দিয়াছিল।

সত্যই অপূর্ব্ব সুন্দরী। মৃত্যু তাহাকে মলিন করে নাই।

একটু ইতস্তত করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "সেই বোমার দলের ছেলেটি আবার আসবে?"

"কি করবে তা জেনে?"

দেখিলাম, ঠোঁট দুইটি তাহার কাঁপিতেছে।

"ঠাট্টা করবেন না?"

"না।"

"দেখুন, আমার আকণ্ঠ পিপাসায় ভ'রে আছে। সারা জীবনটা এক বিন্দু ভাল ঠাণ্ডা জল পেলাম না। পচা নর্দ্দমার জল কখনও খাওয়া যায়? জীবনে একটাও নদী দেখতে পাই নি, খালি নর্দ্দমা—কেবল দুর্গন্ধ পচা জল। দারুণ পিপাসায় তাও কতবার তো খেয়েছি। তবু মৃত্যু হয় নি। মরবার জন্যে শেষটায় দড়ি খুঁজতে হ'ল। কিন্তু মৃত্যুর পরও দেখছি, পিপাসা তো সমানই আছে। একটুও কমে নি। সমস্ত সত্তা এক বিন্দু ভাল জলের জন্যে এখনও হাহাকার করছে। একটু জল পেলে যেন বাঁচি। সেদিন সেই কবিকে ঠাট্টা করলাম বটে, কিন্তু সে ঠিকই বলছিল বোধ হয়। জীবনে প্রেমের আবির্ভাব হ'লে ক্ষুদ্র জলাশয় সমুদ্র হয়ে ওঠে, লোহা সোনা হয়ে যায়। সেদিন সেই যে ছেলেটি দেখলাম আপনার কাছে, কোথায় সে? আহা,

ঠিক যেন ঝরনা! ও কি—ও কে—এ কি—মৃত্যুর পরও লোকটা সঙ্গে সঙ্গে এসেছে! এখানেও মুখপোড়ারা সঙ্গ ছাড়বে না!"

রমণী অন্তর্হিত হইল।

দেখিলাম, সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি লোক টলিতেছে।

লম্বা শীর্ণ তাহার দেহ। গালের হাড় দুইটা অসম্ভব রকম উঁচু। জবাফুলের মত চক্ষু দুইটা বিস্ময়-বিস্ফারিত করিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে। জড়িতস্বরে শুনিলাম বলিতেছে—

"ডাক্তার, কতখানি মাল আমার পেট চিরে পেয়েছিলে বল তো বাবা? সেদিন কি সোজা মাল টেনেছিলাম! দু বোতল নির্জ্জলা হুইস্কি। পরের পয়সায়। মাইরি বলছি—"

বলিয়া লোকটা আবার টলিতে লাগিল।

"পরের পয়সায় বাজি রেখে খেয়েছিলাম। গলাটা জ্ব'লে পুড়ে খাক হয়ে গেস্‌ল, মাইরি বলছি। আমার মতন পাঁড় মাতাল সঙ্গে সঙ্গে কাত—কোন্ শালা মিছে কথা বলে!—একেবারে বেহুঁশ।"

আবার খানিকক্ষণ টলিয়া সে শুরু করিল—

"পরের পয়সায়, মাইরি বলছি। নিজের পয়সা পাব কোথা? ট্যাক তো হরদম গড়ের মাঠ। এক জমিদার-পুত্তুর কাপ্তেন পাকড়েছিলাম, সেই শালার সঙ্গে বাজি রেখে তারই পয়সায় এই কাণ্ড। মাইরি বলছি। ভেবেছিলাম, ঘুমিয়ে পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন তো দেখছি, যা বাবা, সব

ফরসা—ম'রেই গেছি। এমন বেকুব আর জীবনে কখনও হ
নি। মাইরি বলছি। হ্যাঁ, আমাদের বিন্দীর গলার আওয়াজ
যেন শুনলাম। আমাদের বিন্দী-বাঈজী। চেনো তাকে
ভাল নাম বোধ হয় বিনোদিনী। বেড়ে নাচে বেটী! ও
কোমর ঘোরানো যদি দেখ একবার! একখানি 'চিজ'—মাইরি
বলছি।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া লোকটা বিড়বিড় করিয়া কি বলিতে
লাগিল। চক্ষু দেখিলাম বুজিয়া আসিতেছে। হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া
বলিল—"আচ্ছা ডাক্তার, এ অঞ্চলে আবগারির দোকান
কোন্‌খানটায় আছে জান কি? মদের ভাঁটি? অন্ততপক্ষে
তাড়িখানা? একটু না টানলে কেমন যেন বেজুত মনে হচ্ছে,
মাইরি বলছি।"

টলিতে টলিতে লোকটা অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

বিনিদ্র নয়নে একা বসিয়া আছি।

মনে হইতেছে…।

বাঁচিয়া আছি, অথচ বাঁচিয়া থাকার অর্থ বুঝি না। মৃত্যুর
সহিত প্রত্যহ মুখামুখি দেখা হয়, তাহাকেই চিনি কি? রোজ
তো তাহার কত রূপই দেখিতেছি! কত জননীর কোল খালি
করিয়া ফুটন্ত ফুলের মত কত শিশু সে ছিঁড়িয়া লয়! আশা-
আকাঙ্ক্ষা-উদ্যম-পূর্ণ কত উন্মুখ জীবন অকালে শেষ করে! ক

স্বপ্ন চূর্ণ করে, কত সাধের বাগান বিশুষ্ক করিয়া দেয়! নির্ম্মম সে, নির্দ্দয় হস্তে নির্ব্বিচারে সংহার করিয়া চলিয়াছে।

আবার সেই একই মরণের আর এক রূপ। করুণাময় আবির্ভাব। অনাহারক্লিষ্ট অভিশপ্ত জীবনের সকল আগুন সে মুহূর্ত্তে নিবাইয়া দেয়। বার্দ্ধক্যপীড়িত জরাগ্রস্ত লোলচর্ম্ম বৃদ্ধের সকল অশান্তির অবসান করে। জীবনের সকল অপমান, সকল লজ্জা, সকল কলঙ্ক, সকল শোক, সকল দুঃখের উপর স্নিগ্ধ অন্ধকার যবনিকা টানিয়া দেয়। মহামুক্তিময় বিস্মৃতির দেশে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়।...

গল্প-পুস্তকে আবার মনোনিবেশ করিয়াছি।

"ওপারে উঁচু তীরের চড়াই ভাঙিয়া তাহারা প্রকাণ্ড এক জলাভূমিতে উপস্থিত হইল। বরফ-শীতল তাহার জল। সেই জল ভাঙিয়া যাইতে হইবে। মেয়েটির চোখে কেমন যেন একটা অনিশ্চয়তার ভাব ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল, সে যেন পথ ঠিক করিতে পারিতেছে না। এই জলাভূমিতে পথ হারাইলেই মুশকিল।

হঠাৎ সে দূরে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "রগ।" দেখা গেল, দূর দিগন্ত হইতে মেঘের মতন কি যেন একটা তাহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

একটু পরেই বোঝা গেল, কুয়াশা। নিমেষমধ্যে তাহারা ঘন

চাই। যেমন ক'রে হোক, অনেক টাকা চাই। পরজন্মে কোটিপতি হয়ে জন্মাতে চাই। এর জন্যে যে কোন তপস্যা, যে কোন কৃচ্ছ্র-সাধন করতে আমি প্রস্তুত আছি। নির্ম্মলকে একবার দেখে নেব। এমন শিক্ষা তাকে দিয়ে দেব যে, পাথরও শিউরে উঠবে। দ'লে, পিষে, পুড়িয়ে মেরে ফেলতে চাই। টাকা চাই—টাকা চাই—টাকা চাই—টাকা—টাকা—টাকা—"

চক্ষু দুইটি হইতে আগুনের হলকা ছুটিতে লাগিল।

ক্যালেণ্ডারের ছবিখানাও দেখিলাম উৎসুক আগ্রহে শুনিতেছে। তাহার চক্ষুতেও ভাষা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেও যেন বলিতেছে—

"ঠিক বলিয়াছ বন্ধু, টাকাই সব। আমার এই প্রস্ফুটিত যৌবনটিকে শিল্পীর দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলাম টাকারই জন্য। বর্ণের বন্ধনে বন্দী হইয়া টাকারই বন্দনা করিতেছি আমার দেহের সমস্ত মাধুরী দিয়া প্রলুব্ধ দর্শকের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে প্রসারিত করিয়াছি শুধু টাকার জন্য। আমার অঙ্গের এই প্রদীপ্ত বর্ণবিন্যাস, বিকশিত এই যৌবনশ্রী নীরব ভাষায় সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে—টাকা দাও, টাকা দাও, ওগো, কিছু টাকা দিয়া যাও।"

বাহিরে অকস্মাৎ এক ঝলক তীব্র বিদ্যুতের আলো অন্ধকারকে চিরিয়া ঝলসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বজ্র-পতনের শব্দ। তাহার পর সব চুপচাপ।

বাতাসের বেগে আলোটা নিবিয়া গিয়াছিল। উঠিয়া আবার জ্বালিয়া দিলাম। জ্বালিয়া দেখি, সেই প্রজাপতিটা আবার উড়িয়া বেড়াইতেছে। একটু আগেই তো পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল!

মুমূর্ষু ভেকের করুণ আর্ত্তনাদটা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিলাম!

সহসা নিজের বিগত জীবনটা মনে পড়িল।

কি দুঃখের সে জীবন! বাবা ছিলেন অতি সামান্য একজন কেরানী। মাহিনা পাইতেন পঁয়তাল্লিশ টাকা। খোলার বাড়িতে বাস করিতাম। আমরা ছিলাম তিন ভাই, পাঁচ বোন। আমাদের এই ধর্ম্মপ্রাণ দেশে কেরানীর ঘরে মেয়ে! কি কষ্ট করিয়াই যে ছেলেবেলাটা কাটিয়াছে, এখন মনে হয়, যেন দুঃস্বপ্ন!

আমার বাবার কথা মনে পড়িতেছে। জীবনে তিনি এতটুকু শান্তি পান নাই। সকালে কোনক্রমে দুইটি ভাত মুখে দিয়া আপিসে যাইতেন, ফিরিতেন রাত্রি আটটায়। ফিরিয়া আসিয়াও যে শান্তি পাইতেন, তাহা নহে। বাড়িতে মায়ের গঞ্জনা তাঁহার দৈনিক বরাদ্দ ছিল। মায়েরও দোষ ছিল না। তিনিও মানুষ ছিলেন তো, শরীরে রক্ত-মাংস ছিল। সুতরাং একটা ভাঙা খোলার ঘরে অতগুলি ছেলেমেয়ে লইয়া একা হাতে সংসার চালাইবার পর মানসিক সামঞ্জস্য রক্ষা করা তাঁহার দ্বারা সম্ভবপর হইত না। মুখে মিষ্ট কথা ফুটিত না। সাধারণ

কথাও কটু হইয়া উঠিত। মেয়েরা নীরবে নিজেদের ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্ট হয়তো সহ্য করিতে পারে। কিন্তু সন্তানের দুঃখ বহন করা তাহাদের সাধ্যাতীত। সন্তানদের একটু ভাল খাবার খাওয়াইবার জন্য কিংবা একটু ভাল জামা-কাপড় কিনিয়া দিবার জন্য দরিদ্র জননীরা অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন করেন। আমার মা-ও কম কৃচ্ছ্রসাধন করিতেন না। আমার একই মা পয়সা বাঁচাইবার জন্য ধোপানী, চাকরানী, রাঁধুনী সবই ছিলেন বাড়িতে হাতে সেলাই করিয়া দরজীর কাজও করিতেন। কিন্তু এত পরিশ্রম করিয়াও তিনি তিন পুত্র এবং পাঁচ কন্যার অধিকাংশ অভাবই মিটাইতে পারিতেন না। নিকটেই আর এক উপদ্রব ছিল। পাশের বাড়িতে একজন ধনী থাকিতেন। তাঁহার বাড়িতে নিত্য উৎসব। তিন-চারখানা মোটরকার নানা বিচিত্র শব্দ করিয়া বারম্বার যাতায়াত করিত। গ্রামোফোন দিন রাত বাজিতেছে। একদল ফুটফুটে ছেলেমেয়ে। কাহারও চাঁপা-রঙের সুন্দর সিল্কের ফ্রকের উপর দোদুল্যমান বেণী, কেহ 'সেলার্স সুট' পরিয়া বগলে ফুটবল লইয়া চলিয়াছে, কাহারও মুখে সুন্দর বাঁশী, কাহারও হাতে রঙিন বেলুন। নিত্য নূতন খেলনা লইয়া নিত্য নূতন রঙিন পরিচ্ছদ পরিয়া তাহারা আমাদের নয়ন ধাঁধিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। তালি-দেওয়া কাপড় এবং শতছিন্ন জামায় অঙ্গ আবৃত করিয়া আমরা প্রলুব্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিতাম। কি যে ভাবিতাম, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন।

সুতরাং আমার মায়ের মনে শান্তি ছিল না। প্রতিক্রিয়াটা গিয়া পড়িত বাবার উপর। তাঁহার উপরই তিনি যেন শোধ তুলিতেন।

বাবা কোনদিন কিছুই বলিতেন না। এই গঞ্জনাটাও অন্যান্য বহুবিধ দুঃখের মত তিনি নীরবে সহ্য করিতেন। অসাধারণ তাঁহার সহ্যশক্তি ছিল। মা কিন্তু এই সহ্যশক্তির মর্য্যাদা দিতেন না। এই সহ্যশক্তির জন্যই মায়ের কাছে তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। তাঁহাকে কত দিন বলিতে শুনিয়াছি—

"মানুষের রক্ত কি তোমার গায়ে নেই, না কি? এই যে ছেলেগুলোর গায়ে একটা জামা নেই, মেয়েটা সর্দ্দিতে ঝামরে রয়েছে, দেখতে পাও না তুমি? তোমার ওগুলো মানুষের চোখ, না পাথরের?"

বাবা কখনও কোন প্রত্যুত্তর করিতেন না। তাঁহার মনে কোনদিন কোন বিকার দেখি নাই। আপিসের জামা-জুতা ছাড়িয়া হাত-মুখ ধুইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে তিনি সন্ধ্যাহ্নিক করিতে বসিয়া যাইতেন। হয়তো পরমব্রহ্মের চিন্তাই করিতেন।

"দেখুন তো ডাক্তারবাবু, আমি কি দেখতে খুব খারাপ?"

স্থূলাঙ্গিনী কালো একটি মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

"সত্যি কি দেখতে আমি খুবই বিশ্রী? কেউ আমাকে পছন্দ করলে না। দলে দলে লোক এল আর চ'লে গেল। কেউ আমাকে পছন্দ করলে না। কিছুতেই বিয়ে হ'ল না।"

মেয়েটি যে কুৎসিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"বলুন না আপনি, আমি কি দেখতে খুব খারাপ ?"

অসঙ্কোচে বলিলাম—"না।"

"তবে আমাকে কেউ পছন্দ করলে না কেন ? কেন এমন ক'রে আফিং খেয়ে মরতে হ'ল আমাকে ? আমার এই দেহটা তো আমি সৃষ্টি করি নি। কে সৃষ্টি করেছিল জানেন আপনি ? ঠিকানা জানেন তার ?"

তাহার দুই চক্ষু ব্যাঘ্রীর মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

"এই যে আমার রঙ কালো, ঠোঁট পুরু, সামনের দাঁত উঁচু, নাকের ডগাটা শুকচঞ্চুর মত নয়, এর জন্যে দায়ী কে ? আমি তার কাছে জবাবদিহি চাই। আমি তাকে চীৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করতে চাই, কেন তুমি একজনকে রূপসী, আর এক-জনকে কদাকার করেছ ? কেন—কেন—কেন ? কি অপরাধ করেছিলাম তোমার কাছে ?"

চীৎকার করিতে করিতে সে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

আমার বাবাও কি কম ভুগিয়াছিলেন মেয়েদের লইয়া ! এক-আধটা নয়, পাঁচ-পাঁচটি মেয়ে। তিনটির বিবাহ দিতেই তাঁহার সর্ব্বস্ব বিক্রয় হইয়া গেল। দেশে দশ বিঘা জমি ছিল তাহাও গেল, পূর্ব্বপুরুষের ভিটাটা ছিল সেটুকুও গেল। কিছুই আর অবশিষ্ট রহিল না।

"ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু!"

সেই অ্যানার্কিস্ট ছোকরাটি ছুটিয়া আসিয়াছে। ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

"ওই লোকটাকে চ'লে যেতে বলুন না। দেখলেই আমাকে তাড়া করছে। এই দেখুন, কামড়ে দিয়েছে।"

সেই দীর্ঘাকৃতি কালো লোকটা আসিয়া দাঁড়াইল। গলায় ক্ষুরের ক্ষতচিহ্নটা রক্তাক্ত। সমস্ত মুখ হিংস্র। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—

"কামড়ে আমি তোমার গলার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলব। জুয়াচোর, বদমায়েস, পাজি কোথাকার! বল, কোথায় আমার মেয়ে?"

যুবকটি কাতর স্বরে বলিল—"আমায় বিশ্বাস করুন। আমি আপনার মেয়ের কোন খবর জানি না। আমি কখনও দেখি নি তাঁকে।"

ভীমগর্জ্জনে লোকটি উত্তর দিল—"তুমি না জান, তোমার বন্ধুরা জানে। খুঁজে আন, যেখান থেকে পার খুঁজে আন। তা না হ'লে তোমার টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলব আমি।"

লোকটা মুখব্যাদান করিয়া দুই পাটি প্রখর দন্ত মেলিয়া তাহার দিকে আগাইয়া গেল।

যুবক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল।

"কিচ্ছু শুনতে চাই না আমি। আমার দোকান ফিরিয়ে দাও, আমার মেয়ে ফিরিয়ে দাও।"

তাহার গলার ক্ষতটা রক্তের ফেনায় ভরিয়া গেল।

আবার সব চুপচাপ।

প্রজাপতির প্রেতাত্মা আলোকশিখাকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়াছে।

ইহাদের সহিত নিজের জীবন মিলাইয়া দেখিতেছি। কি আর এমন বেশি তফাত! বিশেষ কিছুই নাই। যে অবস্থায় পড়িয়া ইহারা আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে, সেই অবস্থায় আমিও তো পড়িয়াছিলাম। কেন যে আত্মহত্যা করি নাই, আশ্চর্য্য!

আমি যেবার আই. এস-সি. পাস করিলাম, তখন ছোট ভাই দুইটি ম্যাট্রিক ক্লাসে। দুইজনেই তাহারা এক ক্লাসে পড়িত। আমরা তিনজনেই লেখাপড়ায় ভাল ছিলাম, ক্লাসে কেহ কখনও সেকেণ্ড হই নাই। স্কলারশিপের টাকাতেই আমাদের লেখাপড়ার খরচ বরাবর চলিয়াছে। আমাদের নানা দৈন্যের মধ্যে এইটুকুই সুখ ছিল।

যেবার আমি আই. এস-সি. পাস করিলাম, সেইবারই বাবা আর কালবিলম্ব না করিয়া আমাকে তাঁহার আপিসে ঢুকাইয়া দিলেন। ইহার ঠিক পরে যাহা ঘটিল, তাহার মত আশ্চর্য্য ব্যাপার আমি জীবনে আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। হয়তো কাকতালীয়বৎ ঘটনা, কিন্তু খুবই বিস্ময়জনক।

যেদিন আমার চাকরি হইল, সেই দিনই বাবারও মৃত্যু হইল। আশ্চর্য্য সেই মৃত্যু! রাত্রে রোজ যেমন খাওয়া-দাওয়া করিয়া শুইয়া পড়িতেন, সেদিনও তেমনই শুইয়াছিলেন। কোন অসুখ

ছিল না। সকালে উঠিয়া আমরা দেখিলাম, তিনি মারা গিয়াছেন।···আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রের চাকুরি জুটাইয়া দিয়া আশা করি তিনি পরম নিশ্চিন্তেই অন্তিম নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন। অবনী ঠাকুরের "শেষ বোঝা" ছবিটা দেখিয়া বাবার কথা মাঝে মাঝে মনে হয়।

আর মা ?

তিনিও কি কম দুঃখ-কষ্ট পাইয়াছেন জীবনে! দরিদ্র ননীর অন্তর্নিহিত ব্যথা-বেদনার পরিমাপ করা আমার সাধ্যাতীত। কত অপূর্ণ সাধ, কত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মাতৃ-হৃদয়কে আলোড়িত করিত তাহা জানি না। এইটুকু জানি যে, বহুদিন তিনি অনাহারে কাটাইতেন। নানারূপ ব্রত উপবাস তো ছিলই। আহারও সব দিন কুলাইত না। বাবার মৃত্যুর পর আমাদের আয় কমিয়া গিয়াছিল। যাহা জুটিত তাহা অল্পই, এবং তাহার সমস্তটাই মা আমাদের দিয়া নিজে কোন ছুতায় উপবাস করিতেন।

"ডাক্তারবাবু, এ তো বেঁচে নেই, কেন মিছে কথা ব'লে আমাকে ভোলাচ্ছ তুমি ?"

সন্তানহত্যাকারিণী সেই জননী, আর তাহার কোলে সেই মৃত শিশু।

এ কি কখনও বাঁচতে পারে ? বাঁচা কি সম্ভব ? মা যখন নিজের ছেলের গলা টিপে ধরে, তখন সে ছেলে কি আর

বাঁচে? আমার মত পিশাচী আর কজন দেখেছ তুমি ডাক্তা
বাবু? পৃথিবীতে কি রোজ এমনই শিশুহত্যা হয়? অনে
হয়? চন্দ্রসূর্য্য কি উঠছে এখনও? ভূমিকম্পে পৃথিবী এখন
ফেটে যায় নি?" মৃত সন্তানটাকে বুকে জড়াইয়া চাপিয়া ধরিল

"বাছা আমার—বাছা আমার—"

অনেকক্ষণ কাহারও মুখে কোন কথা নাই।

তাহার পর ধীরে ধীরে সে আমার আরও কাছে আসি
বলিল—

"কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার কি জান ডাক্তারবাব
কি বল তো? তাকে এখনও আমি ভুলি নি। সেই কাল
এখনও ব'সে আমার মনের বাঁশী শুনছে। ফণা বিস্তার ক'
এখনও আমার বুকের ভেতর কুণ্ডলী পাকিয়ে ব'সে আছে
কিছুতেই নড়বে না। কিছুতেই তাকে তাড়াতে পারছি ন
একটা উপায় ব'লে দাও, কি করলে আমি সব ভুলতে পা
আমায় ব'লে দাও, কি ক'রে এই স্মৃতির হাত থেকে রক্ষা পা
আমাকে সমস্ত ভুলিয়ে দাও তুমি।"

তাহার শুষ্ক নয়ন-পল্লবে এক ফোঁটা জল নাই।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল
সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা জলের ঝাপটা। বাহিরের আক
মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টি নামিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী অঝোরঝ
কাঁদিতেছে। বিদ্যুৎ নাই, বজ্র নাই, কেবল বৃষ্টি। অশ্র

কান্নার মত অবিশ্রান্ত বর্ষণ। ক্যালেণ্ডারের ছবিটার দিকে চাহিয়া দেখিলাম। তাহার চোখেও জল।

বর্ষণমুখরিত অন্ধকারকে বিক্ষুব্ধ করিয়া কবির গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতে লাগিল—

"পড়ি নাই ঘুমায়ে তো, ছিলাম না জাগিয়াও,
চোখে এসেছিল বুঝি তন্দ্রা!
সেই তন্দ্রার ঘোরে এসেছিলে সখী মোর—
আহা যেন গীতি মধু-ছন্দা!
তন্দ্রায় ভর করি
এসেছিলে মরি মরি
জাগরণে ব'সে আজি সে কথা স্মরণ করি,
সে কথা গুমরি ওঠে গভীর আঁধার ভরি
বুকে করি রাখে নিশিগন্ধা!

সে স্বপন ক্ষণিকার,
জ্যোতি যেন মণিকার
মনের আঁধার ভরি ঠিকরিছে অনিবার,
আকাশের শশীতারা সে আলোক-কণিকার
প্রসাদ বিহনে হায় বন্ধ্যা!"

চতুর্দ্দিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। রিম-ঝিম রিম-ঝিম বর্ষণের সুরের সহিত কবির উদাত্ত গম্ভীর স্বর এক অপরূপ ঐক্যতান

সৃষ্টি করিল। জানালা দিয়া হিমশীতল বাতাস প্রবেশ করিতেছে। কম্পমান দীপশিখাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রেত-পতঙ্গটি অবিরাম ঘুরিয়া মরিতেছে। কবি ধীরে ধীরে আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার বিদীর্ণ মস্তক হইতে কপাল বাহিয়া বিধ্বস্ত মস্তিষ্কটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। অনাবৃত মস্তিষ্কের উপর বৃষ্টির ছাট লাগিতেছে। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, কালো কালো যাহা লাগিয়া আছে, তাহা রক্ত নয়—কাদা। কবি আসিল ও আবার ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

আমিও প্রেমে পড়িয়াছিলাম।

বাবা কত কষ্ট করিয়া যে চাকরিটি যোগাড় করিয়া দিয়া মারা গেলেন, আমি তাহা রাখিতে পারিলাম না। এক মাস যাইতে না যাইতে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম।

কেন আসিলাম? নিজেকে সহস্রবার জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর পাইয়াছি, তাহা সদুত্তর নহে।

আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়াছিল সত্য, কিন্তু ঠিক সেইজন্যই যে আমি চাকুরি ছাড়িয়া দিলাম, তাহা সত্য নহে। আরও একটা কারণ ছিল। প্রেমে পড়িয়াছিলাম। মানুষ যখন প্রেমে পড়ে, তখন কোন হীন কাজ করিতে সে সঙ্কোচবোধ করে। তাহার কাছে নিজেকে একটা কুড়ি টাকা মাহিনার কেরানী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা করিত।

পঙ্ক হইতেই পঙ্কজের উদ্ভব। আমার দারিদ্র্যের মলিনতাকে ধন্য করিয়া জীবনে প্রেমের ফুল ফুটিয়াছিল। কালো মেঘে কি আলো প্রতিভাত হয় না?

এক সহপাঠীর বাড়িতে আমার গতিবিধি ছিল। কলেজে ভাল ছেলে বলিয়া আমার খাতির—সরস্বতীর দরবারে ধনী দরিদ্রের জাতিভেদ নাই, সেখানে আমার ললাটেই বিজয়ীর বরমাল্য। চেহারাও খুব যে কুৎসিত ছিল, তাহা নয়। সুতরাং আমার বন্ধুর ভগ্নী মুগ্ধ হইলেন, আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। আমিও মুগ্ধ হইলাম।

জীবনে নূতন পালা শুরু হইল।

"গল্পটা বেশ জমিয়েছন তো!"

ফিরিয়া দেখি, একটা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ভিখারী দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। হাতে একটিও আঙুল নাই। নাক মুখ চোখে কুৎসিত ব্যাধিটার প্রকোপ নিদারুণ বীভৎসতায় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

"গল্পটা বেশ জমিয়েছেন আপনি। কিন্তু তার আগে আমার কবিতাটা শুনে নিন। যদিও জীবনে কবি ব'লে বাজারে নাম ছিল না, আমার একটা কবিতাও কখনও মাসিক-পত্রে বেরোয় নি; কিন্তু আমার মনে কবিতা ছিল। যদিও খেতে পেতাম না, ভিক্ষে ক'রে খেতে হ'ত, তবু আমি কবি ছিলাম।"

বলিয়া সে কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল—

"চিরটা কাল কষ্ট পেলাম
জীবনভরা দুঃখ-জরা ;
মধ্যে মাঝে ভুলে যেতাম
সুন্দরী এ বসুন্ধরা।

সবুজ কচি দূর্ব্বাদলে
স্বর্ণরবি পূর্ব্বাচলে
কজ্জলিত স্নিগ্ধ মেঘে
মুগ্ধ হ'ত মনটা ঠিকই।

কিন্তু তবু সর্ব্বখনে
সর্ব্বদেহে সর্ব্বমনে
ব্যাধি এবং ক্ষুধার জ্বালা
কি যন্ত্রণা বলুন দিকি!

কি যন্ত্রণা ভোগ করেছি
হায় রে, অহোরাত্রি ভরা,
মধ্যে মাঝে ভুলে যেতাম
সুন্দরী এ বসুন্ধরা।

কোন্ লগনে, কার তাগিদে,
কিসের মোহে, কাহার স্নেহে,

কোন্ জননী জন্ম দিল
জানি না তো সে কোন্ গেহে !

অভাগাটার জন্য হা রে
কোন্ রমণী স্তন্যধারে
সুধার ধারা ঝরিয়েছিল
ঠিকানা তার দিল না কেউ !

সত্যি সে কি আমার লাগি
দীর্ঘ নিশি থাকত জাগি ?
মিথ্যা কথা ! মিথ্যা কথা !
আমার কভু ছিল না কেউ !

স্নেহের কভু দেয় নি আভাস
ব্যাধিই দিল সর্ব্বদেহে
কোন্ জননী জন্ম দিল
জানি না তো সে কোন্ গেহে !

কাহার পাপে জন্ম হ'ল ?
কাহার শাপে হেথায় এলাম ?
কোথা সে মোর পিতামাতা,
যাদের লাগি শাস্তি পেলাম !

নাকটা বসা—চোখটা কানা
দুষ্ট ব্যাধি অঙ্গে নানা
কুষ্ঠ ব'লে করত ঘৃণা
　　সুস্থ যত মর্ত্ত্যবাসী।

লজ্জানত মস্তকেতে
সবার দ্বারে হস্ত পেতে
পেটের দায়ে তাড়িয়ে কুকুর
　　কুড়িয়ে খেয়ে শুকনো বাসি

দিন কেটেছে মর্ত্ত্যলোকে ;
　　এর বেশি আর কিবা পেলাম !
মোটর চাপা প'ড়ে সেদিন
　　সত্যি আমি বেঁচে গেলাম।

একটি শুধু দুঃখ আমার
　　ত্রাণ করেছে যে আমারে
সে নাকি আজ পাচ্ছে সাজা
　　মর্ত্ত্যলোকে কারাগারে !

আমার কথা ভুলে গেলেন ডাক্তারবাবু? আমার সেই
মোটর-চাপা শবদেহটা আপনি কেটে-ছিঁড়ে পরীক্ষা ক'রে

দেখেছিলেন। এত ক'রেও কিন্তু সুবিচার করতে পারলেন না আপনারা। বিচারে 'ড্রাইভার' বেচারা দোষী ব'লে সাব্যস্ত হ'ল। কিন্তু সে বেচারার কোন দোষ ছিল না। আমি ঝাঁপিয়ে গিয়ে তার মোটরের তলায় প'ড়ে আত্মহত্যা করেছিলাম। সে আমাকে চাপা দেয় নি। সাধ্যমত বাঁচাবার চেষ্টাই করেছিল। আপনারা সবাই দয়ালু, সবাই আমাদের বাঁচাবার চেষ্টাই করেন।"

লোকটার চোখ-মুখে একটা অদ্ভুত বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল—"আপনারা সবাই মহাদয়ালু, আপনারা সক্কলে—কেউ কখনও একটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে, কেউ এক মুঠো চাল দিয়ে, কেউ—"

হঠাৎ তাহার কথা থামিয়া গেল। সে সামনের দেওয়ালটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া নিস্তব্ধ হইয়া গেল। দেখিলাম, সে ক্যালেণ্ডারের ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছে। মুখে একটি কথা নাই। ক্যালেণ্ডারের ছবিখানাও দেখিলাম তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।

সেই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকটা ধীরে ধীরে সেই ছবিখানার দিকে আগাইয়া গেল। ছবিটার সহিত মুখামুখি দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—

"তোমাকে যেন চিনি ব'লে মনে হচ্ছে! তুমিই কি আমার মা? এত আপনার ব'লে মনে হচ্ছে কেন তোমাকে? কে তুমি—বল, বল, কথা কও, কে তুমি? ঠিক তুমি আমার মা। আমার মা! এত সুন্দরী ছিলে তুমি, অথচ আমি এত কুৎসিত!"

একটা দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকিয়া ক্যালেণ্ডারখানাকে মেঝেতে ফেলিয়া দিল। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকটা সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইল। আমি উঠিয়া ক্যালেণ্ডারখানা কুড়াইয়া আবার টাঙাইয়া রাখিলাম।

ছবিখানা কাঁদিতেছে ?

মেয়েমানুষ কত সহজে কাঁদে—আবার কত সহজে হাসে! সেও কাঁদিয়াছিল। যে মুহূর্ত্তে নিঃসংশয়ে ঠিক হইয়া গেল যে আমাদের মিলন অসম্ভব, সে মুহূর্ত্তে আমার বুকে মুখ লুকাইয়া সে কি কান্না! বিবাহের পর আবার তাহাকে হাসিতেও দেখিয়াছি। সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, সীমন্তে সিন্দূর, দেহের প্রতি পরমাণুতে যৌবনের মাদকতা। ধনীর দুহিতা, ধনীর বনিতা, ধনীর পুত্রবধূ। হাসিবে না কেন ? তাহার কান্নাও যেমন সত্য, হাসিও তেমনই সত্য।

জীবনে আমার সেই প্রথম প্রেম এবং প্রথম ব্যর্থতা। যাহাকে ভালবাসি সে যখন চলিয়া যায়, তখন মনে হয়, বিশ্বের হাটে একেবারে দেউলিয়া হইয়া গেলাম যেন। মূলধন যে তখনই হাতে আসিল, সে কথা বুঝিতে দেরি লাগে।

তাহাকে পাই নাই, ইহাই তো পরম দুঃখ। কিন্তু যখন বুঝিলাম যে, আমি গরিব বলিয়াই তাহাকে পাই নাই, তখন সে মর্ম্মান্তিক বেদনা হীনতার ছোঁয়াচ লাগিয়া অত্যন্ত শ্রীহীন হইয়া উঠিল। নিজেই নিজেকে বিদ্রূপ করিয়া বারম্বার হাসিলাম— “বামন হইয়া চাঁদে হাত দিবার শখ মিটিয়াছে তো ? যাহাকে

অতবড় একটা নেটিভ স্টেটের দেওয়ান সাধিয়া পুত্রবধূপদে বরণ করিয়া লইয়া গেল, তাহাকে তুমি অধিকার করিতে চাও! স্পর্দ্ধা তো তোমার কম নয়!"

সত্যই আমার স্পর্দ্ধা কম ছিল না। গগনস্পর্শী স্পর্দ্ধা অচিরেই ধূলিসাৎ হইল।

আরও কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা আমার অদৃষ্টে বাকি ছিল। দারিদ্র্যের অনল চতুর্দ্দিক হইতে শত শিখা বিস্তার করিয়া আমাকে বেড়িয়া ধরিল।

নিঃসম্বল অবস্থায় বাড়িভাড়া দিয়া থাকা সম্ভব ছিল না। যতদিন আমি একটা কিছু জুটাইতে না পারি, ততদিন যদি মামারা আশ্রয় দেন—এই আশা লইয়া মা আমার চতুর্থ বোনটিকে হইয়া পিত্রালয়ে গেলেন। আমি একটা খোলার ঘরে বাকি কয়জনকে লইয়া সংবাদের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

সমস্যার সমাধান হইয়া গেল কিন্তু অন্য প্রকারে। মা চলিয়া যাইবার দুই দিন পরে আমার দুই ভাই এবং ছোট বোনের এক দিনে কলেরা হইল। আমি যে কেন রক্ষা পাইলাম জানি না। গরিবের ঘরে কলেরা হইলে যে কি ব্যাপার হয়, তাহা চোখে না দেখিলে বুঝিতে পারা শক্ত। সে দৃশ্য আমি জীবনে কখনও ভুলিব না।

তখন দীন-দরিদ্র আমরা ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসা করাইবার কথা ভাবিতেও পারি না। ওলাবিবির শরণাপন্ন হইলাম। ওলাবিবিও দয়া করিলেন না। তখন একদিন এক

দাতব্য-চিকিৎসালয়ের ভিখারীর দলে গিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইলাম ডাক্তারবাবুর দাক্ষিণ্যের আশায়। শুনিয়াছিলাম, দরিদ্রদের জন্য দাতব্য-চিকিৎসালয়; সেখানে গিয়া দেখিলাম, দরিদ্রের দল এক জায়গায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে বটে, ডাক্তারবাবু তাঁহার বড়লোক রোগীদের লইয়াই ব্যস্ত। প্রায় দেড় দুই ঘণ্টা কাল দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু চাকুরি করেন, চিকিৎসা করিবার অবসর তাঁহাদের নাই। এই ভিখারীর দলকে এগারোটার মধ্যে বিদায় করিতে হইবে—এই তাঁহাদের লক্ষ্য। এই যাঁহার লক্ষ্য, সমাগত দেড় শত লোকের নানাবিধ ব্যাধির বিস্তৃত ইতিহাস শুনিবার ধৈর্য্য তাঁহার থাকিবার কথা নয়।

সুতরাং আমার কথা শুনিতে শুনিতেই ডাক্তারবাবু প্রেস্‌ক্রুপ্‌শন লিখিতে শুরু করিলেন এবং কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রেস্‌ক্রুপ্‌শনখানা আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"যাও, দিনে রাতে তিনবার ক'রে খাওয়াবে। বার্লি ছাড়া আর কিছু খেতে দিও না।"

বলিলাম, "তাদের পেটে জল পর্য্যন্ত থাকছে না—।" এ কথা ডাক্তারবাবু বোধ হয় শুনিতে পাইলেন না। কারণ তখন তাঁহার সামনে একজন মোটা লোক জিব বাহির করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ডাক্তারবাবু জিবের দিকে লক্ষ্য না করিয়া এক হাতে তাহার নাড়ীটা ধরিয়া অন্য হাতে লেখনী চালনা করিতেছেন।

হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল।

ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিলাম, জীবনে তাহা কোনদিন ভুলিব না। গিয়া দেখিলাম, একজনও বাঁচিয়া নাই। 'মরিয়া যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু কি ভয়াবহ সে মৃত্যু! মল-মূত্র-বমির মধ্যে জড়াজড়ি করিয়া তিনজন শুইয়া আছে। মানুষ নয়, যেন কৃমি!…তাহাদের সেই জ্যোতিঃহীন নিশ্চল চক্ষুগুলি আজও আমি ভুলি নাই। তিনটি সুন্দর ফুলকে ছিঁড়িয়া, মলিন করিয়া, চিতার আগুনে ফেলিয়া দিয়া মহাকাল যেন হা-হা করিয়া হাসিতেছে।

আজ আমি ডাক্তার হইয়াছি। অনেক কলেরা-রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আজ দরিদ্রের ক্রন্দনে আমার হৃদয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। মনে হয়—

"শোন, শোন।"

সেই বিন্দি। অ্যানার্কিস্ট যুবকটিকে ডাকিতেছে। বিন্দির স চেহারা নাই। সুন্দর খোঁপা বাঁধিয়াছে, খোঁপায় বেলফুল গাঁজা। এত সব পাইল কোথা! গালে রঙ, ঠোঁটে রঙ, সুন্দর :না-টানা চোখ দুইটিতে কাজল পরিয়াছে। পরনে মখমল-পাড় ়ুন্দর ফিনফিনে শাড়ি। রীতিমত মোহিনী বেশ!

অ্যানার্কিস্ট যুবকটি বলিল—"কি বলছ?"

ফিক করিয়া হাসিয়া বিন্দি বলিল—"বেশি কিছু নয়, আমার :পছনে এই সেফ্‌টিপিনটা লাগিয়ে দাও না, এই পিঠের দিকে।"

বলিয়া রঙ্গভরে পিছু ফিরিয়া দাঁড়াইল।

অ্যানার্কিস্ট ছোকরাটি একটু ইতস্তত করিয়া শেষে সেফ্‌টিপিন লাগাইয়া দিতে লাগিল।

লাগানো তাহার আর শেষই হয় না।

যে হতভাগিনী বাঁচিয়া থাকিতে পুরুষের মনোযোগের জ্বালায় অস্থির হইয়া গলায় দড়ি দিয়াছিল, মৃত্যুর পর সেও অভিসারিকা সাজিয়াছে এবং ভুলাইতেছে সেই ব্যর্থ প্রণয়ীকে, যে নারীর উপর অভিমান করিয়া সায়ানাইড গিলিয়াছিল শান্তির আশায়!

বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, ঝড়ের বেগ প্রশমিত হইতেছে। পাতলা মেঘের স্তর ভেদ করিয়া জ্যোৎস্নার আভাস ফুটি ফুটি করিতেছে। বৃষ্টি এখনও সম্পূর্ণ থামে নাই। সামনের মাঠের কুলগাছটা দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে। প্রেতিনীর সমস্ত চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে। জোনাকি একটিও নাই। একটা অস্ফুট মর্ম্মরধ্বনি সমস্ত অন্ধকারকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। কাছে দূরে অবিরাম ঝিল্লীরব। সহসা খানিকটা মেঘ সরিয়া গেল দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল, যেন কাহার দুইটি আঁখি কৌতুকভরে আমার দিকে চাহিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে আবার তাহা মেঘে ঢাকিয়া গেল।

বৃষ্টির শব্দ কমিয়া আসিতেছে।

ভেকের আর্ত্তরবটা এখনও শোনা যাইতেছে।

এখনও তাহার মৃত্যু হয় নাই।

আমরাও কি ওই সর্প-কবলিত ভেকের মত পলে পলে মরিতেছি না ?

মহাকাল কৌতুকও করিয়াছেন মাঝে মাঝে। জীবন যখন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল, যখন নিজের অভিশপ্ত জীবনটাকে কোথায় লুকাইব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না, যখন অকূল পাথারে ঝঞ্ঝা আর ঢেউ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়িতেছিল না, তখন সহসা কূল দেখা দিল। আমার সহপাঠী বন্ধুর পিতা আমার দুঃখের ইতিহাস শুনিয়া আমার প্রতি দয়াপরবশ হইলেন। তাঁহারই কৃপায় এবং অর্থসাহায্যে আমি মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। আমার মা অনূঢ়া ভগ্নীটিকে লইয়া পিত্রালয়ে রহিয়া গেলেন। আশা করিতে লাগিলেন, আমি ডাক্তার হইয়া বাহির হইলে সমস্ত দুঃখের অবসান হইবে।

মায়ের গহনাগুলি বিক্রয় করিয়া সানন্দে কলেজের বই কিনিয়া ফেলিলাম। ওই গহনাগুলিই ছিল আমাদের শেষ সম্বল। রহিল শুধু মায়ের আশীর্ব্বাদ এবং আমার অদৃষ্ট।

পড়াশোনার ব্যাপারে অদৃষ্ট বরাবরই ভাল ছিল। ভারতী কোনদিন বরদান করিতে সঙ্কোচ করেন নাই। মেডিকেল কলেজের সমস্ত পরীক্ষাগুলিতেই ফার্স্ট হইলাম। সমস্ত স্কলার্‌শিপ এবং মেডেল আমার করায়ত্ত হইল।

হইল তো, কিন্তু আবার দুঃখের পালা আসিল। নির্ম্মল

আকাশ মেঘে ছাইয়া গেল—বজ্র-বিদ্যুতের ঘটায় চতুর্দ্দিক শিহরিয়া উঠিল।

আমার বন্ধুর পিতা, যাঁহার করুণায় মেডিকেল কলেজে ঢুকিয়াছিলাম, অকস্মাৎ একদিন মারা গেলেন। দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হইলাম। শুধু পিতৃহীন হইলাম যে তাহা নয়, বন্ধুহীনও হইলাম। আমার বন্ধু বি. এস-সি. পড়িতেছিলেন, তিনি একদিন আসিয়া আমাকে বলিলেন—"তুমি ভাই ওই মড়ার হাড়-টাড় নিয়ে বাইরের ঘরটাতে থাক—মা এসব পছন্দ করছেন না। আমিও আজ কদিন থেকে এমন সব বিশ্রী স্বপ্ন দেখছি রাত্তিরে—"

মড়ার হাড় লইয়া আমি তো দুই বৎসর আছি। এতদিন তো মায়ের কোন আপত্তি উঠে নাই—বন্ধুও স্বপ্ন দেখেন নাই। হঠাৎ এই সব হইতে শুরু করিল কেন? কেন যে এমন হইল, প্রথমে তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমার ব্যবহারে নালিশ করিবার মত কিছুই ছিল না। তবে কেন এমন হইল?

অনেক দিন পরে বুঝিয়াছি, ইহার কারণ কি। কারণ আর কিছুই নয়, কারণ আমার কৃতিত্ব। আমি ভাল ছেলে, প্রতি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইতেছিলাম। অথচ আমার বন্ধু বি. এস-সি. পরীক্ষায় বারম্বার ফেল করিতেছিলেন। ইহাই তো যথেষ্ট গ্লানির কারণ। ঈর্ষা মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি খুব কম লোকই ইহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই ঈর্ষা না করিতে

পারে এমন জিনিস নাই। অধিকাংশ কলহের মূলে এই ঈর্ষা হয় প্রত্যক্ষভাবে, না হয় পরোক্ষভাবে বিরাজমান।

যাই হোক, ইহার ফল দাঁড়াইল এই যে, আমার বন্ধুর বাড়ি হইতে আমার বাস উঠিল। তাঁহাদের বাড়িতে দুই বেলা খাইতে ও শুইতে পাইতাম, তাহা বন্ধ হইয়া গেল।

বোঝার উপর শাকের আঁটিটার মত প্রাইভেট ট্যুইশনির ভারও স্কন্ধে তুলিয়া লইলাম। সমস্ত দিন কলেজের হাড়ভাঙা খাটুনির পর একটি ধনীর দুলালকে লইয়া বসিতাম। কি যে তাহাকে পড়াইতাম, তাহা জানি না। বস্তুত কিছুই পড়াইতাম না। সে আপন মনে যাহা খুশি করিয়া যাইত, আমি বসিয়া বসিয়া তাহা দেখিতাম। তাহাকে জোর করিয়া কিছু করিতে বলিলে সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিত। শীর্ণকায় বিষণ্ণ একটি দশ বৎসরের শিশু—নাকটা বসা, দাঁতগুলা খাওয়া-খাওয়া। পিতামাতার নয়নমণি। তাহাকে কিছু বলিবার জো নাই। তাহার পড়াশোনা কিছুমাত্র অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া তাহার বাবাকে একদিন বলিলাম—"ছেলেটিকে একটু শাসন করা দরকার।" ভদ্রলোক নির্ব্বিকারচিত্তে উত্তর দিলেন—"শাসন করবার দরকার নেই। সেজন্য আপনাকে রাখা হয় নি। আপনি সন্ধ্যেবেলাটা ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আটকে রাখুন। পড়াশোনা একটু আধটু করে ভাল, না করে বেশি জোরজবরদস্তি করবার দরকার নেই। দেখবেন খালি, সন্ধ্যেবেলা কিছুতে যেন ওপরে না যায়।" ভদ্রলোক বেশ

মোটা রকম বেতন দিতেন। তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিলাম না। কিছুদিন পরেই বুঝিয়াছিলাম, ছেলেটির সন্ধ্যার সময় উপরে যাওয়ার বাধা কি। ছেলেটির মা পাগল। তাঁহাকে একটি ঘরে তালাবন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় তাঁহাকে জোর করিয়া কিছু খাওয়ানো হয়। জোর করিয়া মুখ ফাঁক করিয়া নল দিয়া খানিকটা খাবার প্রত্যহ তাঁহার মুখে ঢালিয়া না দিলে তিনি অনাহারে মারা যাইবেন—ডাক্তারেরা এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছেন। জোর করিয়া খাওয়ানো ব্যাপারটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু জিনিস। ভদ্রলোক তাই নিজের পুত্রকে নীচে আটকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। লেখাপড়া উপলক্ষ্য মাত্র।

"আমি তোমাকেই বিয়ে করব। তোমার তো চোখ নেই—তুমি তো দেখতে পাও না। তোমাকেই বিয়ে করব আমি।"

সেই কালো মোটা মেয়েটি কথা কহিতেছে। সম্মুখে একটা কবন্ধ দুই লোলুপ বাহু প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

মেয়েটি বলিতেছে—"ওগো, তুমিই আমাকে নাও। যাদের চোখ আছে, তারা আমার কষ্ট দেখতে পেলে না। তোমার ভাষা নেই, তোমার চোখ নেই, তুমি হয়তো আমার ব্যথা বুঝবে।"

একটা দমকা বাতাস ঘরে ঢুকিয়া আলোটা নিবিয়া গেল।

উঠিয়া আবার আলোটা জ্বালিলাম। দেখিলাম, কেহ নাই। কেবল ঘরের মধ্যে খামখানা পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া

বেড়াইতেছে। তুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিলাম। দরকারী চিঠি।

পাগল মায়ের একমাত্র ছেলেকে আটকাইয়া আমার প্রতি-সন্ধ্যা কাটিত। ইহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইলে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, ভদ্রমহিলা কেন পাগল হইয়াছিলেন। কারণ আর কিছুই নয়, উপর্য্যুপরি সাত-সাতটি সন্তান মারা গিয়াছে। এই ক্ষীণজীবী পুত্রটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। সাতটি সন্তানের মৃত্যুর কারণও পরে জানিতে পারি। ভদ্রলোকের দারুণ চরিত্রহীনতা। এত শোক পাইবার পরও তাঁহার স্বভাব বদলায় নাই। পাগলিনী স্ত্রীকে তেতলার ঘরে তালাবন্ধ করিয়া রাখিয়া, ছেলেটিকে আমার তত্ত্বাবধানে দিয়া ভদ্রলোক প্রতিদিন দেখিতাম অভিসারে বাহির হইতেন। গায়ে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে পেটেণ্ট লেদারের পাম্‌শু, হাতে যুঁইফুলের মালা জড়ানো। মদিরা-পানে চক্ষু দুইটি আরক্ত, ডান হাতে একটি দামী সিগার—চকচকে দামী মোটরে চড়িয়া বাহির হইয়া যাইতেন। রাত্রে ফিরিতেন না। মানুষের মধ্যে এই কামপ্রবৃত্তিটা ভগবান দিয়াছিলেন হয়তো সৃষ্টিরক্ষার জন্য। কিন্তু মানুষ সভ্য হইবার পর—কিংবা হয়তো তাহার আগেও—এই প্রবৃত্তিটাকে সৃষ্টি ধ্বংস করিবার উপায় করিয়া ফেলিয়াছে।

কবি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।

অদ্ভুত তাহার চেহারা! মস্তিষ্কটা সবটা যেন বাহির হইয়া আসিয়াছে। চোখের কোণ দিয়া রক্ত গড়াইতেছে।

"আমার ঘুমেতে স্বপন আঁকিয়া আঁকিয়া
মনের মাঝারে পরশ-মাধুরী রাখিয়া
শোভন শরমে মোহন মোহের আড়ালে
সহসা আসিয়া দাঁড়ালে!

তোমার উজল কাজল নয়ন-কিনারে
কোন্ সে দেবতা বাজাল মনের বীণারে
আঁধারে আলোকে চন্দ্রে তারায় তপনে
আধ-জাগরণ স্বপনে!

কার সে মাধুরী তোমার তনুটি ভরিয়া
আমার আঁখির নিমেষ নিল গো হরিয়া!
কহিল মরমে কোন্ সে কাহিনী কি ভাবে
বেহাগ—ললিত—বিভাসে!

তোমার মাঝারে কাহারে দেখি গো গোপনে
স্বপনে তুমি কি ভেবেছ কখনো শোভনে?
ছন্দে ও গানে হয়েছি কাহার পূজারী
মরমখানিরে উজাড়ি?

হয়তো, হে মোর গোপন-মানস-হারিণী,
পাব না তোমারে,—তবু তো বলিতে পারি নি
শুধু মায়া তুমি আর কিছু নও মায়া গো
মিছে ছলনার ছায়া গো!

বলিতে পারি নি তাই তো জীবনে মরণে
কত অঞ্জলি সাজাই তোমার চরণে
গন্ধে বরণে কত না ছন্দ-বাহিনী
কত ক্রন্দন-কাহিনী।"

আসিল এবং চলিয়া গেল।

কামের আর এক মনোহর রূপ। ছন্দে মিলে অনুপ্রাসে নিজের অন্তরের সত্য ও মিথ্যাকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

অনিবার্য্য।

সত্যই অনিবার্য্য।

হঠাৎ একদিন মায়ের চিঠি পাইলাম। চিঠি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম, কারণটা নিতান্ত তুচ্ছ নয়। আমার ভগ্নীটির বিবাহ প্রায় ঠিক হইয়া গিয়াছে। আমি গিয়া প্রয়োজনীয় কথা-বার্ত্তাদি শেষ করিয়া দিলেই শুভকর্ম্ম সমাধা হইয়া যাইবে। প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তার মধ্যে যেটুকু ভীতিপ্রদ, সেইটুকু এ ক্ষেত্রে নাই। টাকাকড়ির জন্য কিছুই আটকাইবে না: পাত্র চপুকে দেখিয়া পছন্দ করিয়াছে। পণ লাগিবে না। প্রফুল্লিত অন্তঃকরণে মাতুলালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

সেখানে গিয়া কিন্তু চক্ষুস্থির হইয়া গেল! স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—পাত্রের বয়স পঁয়ষট্টি, না পঁচাত্তর, না আরও বেশি? প্রত্নতাত্ত্বিক না হইলে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তীর ঠিক বয়স নির্ণয় করা শক্ত। গ্রামে তাঁহার সমবয়সী আর কেহ বাঁচিয়া নাই।

চপুর মুখের হাসি শুকাইয়া গিয়াছে। মায়ের চোখের জল মুখের হাসিতে রূপান্তরিত হইয়া আরও করুণ হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী ব্রাহ্মণের ঘরে কন্যাদায় যে বিষম দায়! মা ওই বৃদ্ধের সহিতই চপুর বিবাহ দিবার জন্য উন্মুখ।

মাকে বলিলাম—"এর চেয়ে চপুকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দাও না।"

মা উত্তর দিলেন—"কেষ্ট চক্কবত্তি যে সুপাত্র নয় তা আমি জানি, তা আর তোমাকে ব'লে বোঝাতে হবে না। কিন্তু যাদের হাতে একটি কানা-কড়িও নেই, তারা এর চেয়ে ভাল পাত্র কি ক'রে জোটাবে বলতে পারিস? চপার বয়স যে সতরো পেরিয়ে আঠারোয় পড়ল, তার হিসেব রাখিস? কেষ্ট চক্কবত্তির একটু বয়স হয়েছে এই যা, তা না হ'লে লোক ভাল। এ অঞ্চলে একটা মানী লোক। ঘরে দু-পয়সা আছে—জমি, বাগান, পুকুর, খাওয়া-দাওয়ার কোন কষ্ট কোনদিন পাবে না। কেষ্ট চক্কবত্তি যখন নিজে থেকে কথাটা পেড়েছেন, তখন এ সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নয়। আমরা গরিব মানুষ, এর চেয়ে ভাল আর পাব কোথায়?"

যুক্তি সারবান সন্দেহ নাই। কিন্তু ওই কামকণ্টকিত লোলুপ লোলচর্ম্ম বৃদ্ধটার হস্তে আমার অমন সুন্দরী বোনটাকে সঁপিয়া দিতে ইচ্ছা হইল না। বৃদ্ধের দন্তহীন মুখের সেই লালায়িত কথাগুলা এখনও আমার কানে বাজিতেছে। তাহার কোটরগত চক্ষুর লুব্ধ দৃষ্টিটা যেন এখনও আমার বুকে বিঁধিয়া বসিয়া আছে।

মাকে বলিয়া আসিলাম—"আরও দিন কতক তুমি সবুর কর, আমি ভাল পাত্রের চেষ্টা দেখছি। আমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে দেখি না একবার খোঁজ ক'রে।"

কলিকাতায় ফিরিয়া বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে খোঁজ করিতে লাগিলাম।

মা দেশে বসিয়া সবুর করিতে লাগিলেন।

আমি খোঁজ করিবার ত্রুটি করিলাম না।

দেশে যে পাত্রের অভাব ছিল, তাহাও নয়। কিন্তু কিছুতেই জুটিল না। বিনা পণে বিবাহ করিতে পারে, এমন একজন অপরিণামদর্শী সচ্চরিত্র যুবক মিলিল না। সকলেই পরিণামদর্শী। ভবিষ্যৎচিন্তা না করিয়া কেহই এক পা অগ্রসর হইতে চাহে না। সকলেই আমার ভগ্নীর গুরুভার স্কন্ধে তুলিয়া লইতে রাজি, যদি ভারবহনের মজুরিটা আমরা দিয়া দিতে পারি। কিন্তু সে সামর্থ্য আমাদের তখন ছিল না। দুইজন যুবক বিনাপণে বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছিলেন। তবু হইল না। একজন লেখাপড়া জানা মেয়ে চান, এবং আর একজন চান নিখুঁত

সুন্দরী। আমার বোনকে লেখাপড়া শেখানো হয় নাই এবং নিখুঁত সুন্দরীও সে ছিল না। সৌন্দর্য্যে তাহার খুঁত ছিল। চুল খুলিয়া দিলে হাঁটু পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিত না।

সুতরাং আমি ক্রমাগত খুঁজিতেই লাগিলাম এবং মা-ও ক্রমাগত সবুরই করিতে লাগিলেন। এই রকমই চলিতেছিল এবং কত দিন চলিত তাহা বলা কঠিন, এমন সময় মামার বাড়ির গ্রামের একটি সদাশয় ছোকরা আসিয়া খবর দিল—

"বাঁচান, বাঁচান আমাকে ডাক্তারবাবু।"

তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে সেই অ্যানার্কিস্ট ছোকরাটি ছুটিয়া আসিল, তাহার পশ্চাতে সেই দীর্ঘাকৃতি কালো লোকটা। তাহার প্রকাণ্ড কালো মুখে সাদা চোখ দুইটা ধকধক করিয়া জ্বলিতেছে—তাহাতে উন্মাদের হিংস্র দৃষ্টি। তাহার গলার ক্ষতটা লাল হইয়া উঠিয়াছে। মনে হইতেছে, যেন একটা প্রকাণ্ড অঙ্গার অগ্নিযোগে নীরবে পুড়িতেছে।

"কারও বাপের সাধ্যি নেই তোমাকে বাঁচায়। আমার মেয়ে নিয়েছ, আমার দোকান নিয়েছ, ছেড়ে দেব তোমাদের? কড়মড় ক'রে চিবিয়ে খেয়ে ফেলব। পাজি, হারামজাদা, শুয়ার—"

বলিয়া ছুটিয়া গিয়া সত্যই সে তাহার গলায় কামড়াইয়া ধরিল।

"বাঁচান—বাঁচান—বাঁচান আমাকে।"

আর্ত্তনাদে সমস্ত অন্ধকার শিহরিয়া উঠিতেছে। লোকটার সমস্ত মুখ রক্তে ভরিয়া গেল।

সহসা বিন্দি ছুটিয়া আসিল। কালো লোকটার চুলের মুঠি ধরিয়া জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি।"

ঝাঁকানি খাইয়া কালো লোকটা যুবকটিকে ছাড়িয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল—"কে তুই ?"

"যেই হই, তুমি ওকে ছেড়ে দাও, ওগো, তোমার তুটি পায়ে পড়ি।"

বিন্দি হঠাৎ নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল।

বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিলাম, কৃষ্ণপক্ষের শীর্ণ চন্দ্র মেঘের গাঢ় তমিস্রা ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিতেছে। তাহার মুখে প্রেতের হাসি। এই জীবন্ত কর্দ্দমাক্ত পৃথিবীর দিকে চাহিয়া মৃত জ্যোতিষ্কটা যেন নীরবে অট্টহাস্য করিতেছে। নিকটেই কাল-পুরুষের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়া আবার মেঘলোকের নিবিড় রহস্যে আত্মগোপন করিল। প্রকাণ্ড বড় একখানা কালো মেঘ ধীরে ধীরে আসিয়া সব ঢাকিয়া দিল। চাঁদও ঢাকা পড়িল, ক্ষীণ জ্যোৎস্নাটুকু মরিয়া গেল।

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে।

ক্ষান্তবর্ষণ গভীর রাত্রির অন্ধকারকে বিঘ্নিত করিয়া ভেকের মৃত্যুকাতর যন্ত্রণাধ্বনি রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। বাহিরে

গাঢ় অন্ধকার। ঘরে কম্পিত দীপশিখাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পতঙ্গটা এখনও ঘুরিতেছে।

যেন একটা এরোপ্লেন।

শিখা আর পতঙ্গ!

আমার বোন···

তাহাকে গুণ্ডায় হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। আমার বুড়ী মা-ও তাহাদের পাশবিক অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পান নাই।

আমার মা-বোনকে যখন গুণ্ডারা ধর্ষিত করিতেছিল, তখন আমি মেডিকেল কলেজে একটি রূপসী নার্সের সহিত নানা ছুতায় আলাপ করিতেছিলাম। তাঁহার সহিত আলাপ করিতে সকলেই উৎসুক হইত। আমিও সুযোগ পাইলে আলাপ করিতাম। আলাপ না বলিয়া প্রেমালাপ বলিলে খুব বেশি অত্যুক্তি হইবে না।

কত কথাই মনে হইতেছে। মনে হইতেছে, সেই সপ্ত মৃত পুত্রের সিফিলিস-গ্রস্ত পিতা, কবিতামুখর প্রেমিক ওই কবি, বিবাহোন্মুখ লোলচর্ম্ম সেই বৃদ্ধ, নারীধর্ষণকারী গুণ্ডা এবং নার্সের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী আমি—একই জিনিস। বিশেষ তফাত তো দেখি না।

কিন্তু না, আমি সব ভুলিতে চাই। নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে চাই সব। কিছুতেই পারি না। অদ্ভুত আমার স্মরণশক্তি! কিছু ভুলি না।···ছেলেবেলায় একটা পাগলা কুকুরকে ঠেঙাইয়া মারিতে দেখিয়াছিলাম।···তাহার ফাটা মাথা, থেঁতলানো চোখ ছুইটা আমি যেন এখনও দেখিতে পাইতেছি। কুকুরটার চেহারা আমার স্পষ্ট মনে আছে। কালো রঙ, একটা কান একটু বেশি ঝোলা, লেজের কাছে একটা প্রকাণ্ড ঘায়ে পোকা কিলবিল করিতেছে। সব মনে আছে। কিছুই আমি ভুলি না। কোথায় কবে ছারপোকাটি মারিয়াছি, তাহার চেহারাটা পর্য্যন্ত স্পষ্ট মনে আছে।

নিস্তব্ধ রাত্রে বিনিদ্র আমার সঙ্গে জাগিয়া আছে আমার স্মরণশক্তি।

প্রেতিনী।

বাবার মুখখানা মনে পড়িতেছে। শান্ত ধীর শীর্ণ মুখটা। দারিদ্র্যের জন্য কোন অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নীরবে নিজের কর্ত্তব্য করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুও তাঁহাকে কোন কষ্ট দেয় নাই। ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন যেন।

একটা ভাষাহীন চীৎকার অন্ধকারকে চিরিয়া চলিয়া গেল।···পেচকের শব্দ? একটা আকুল ক্রন্দন যেন। ল্যাপ-ল্যাণ্ডের হিমশীতল জলাভূমিতে ছুইটি অপরিচিত যুবক যুবতী

দাঁড়াইয়া আছে না? চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা, কেহ কাহারও ভাষা বোঝে না। কুয়াশা নিবিড় হইয়া আসিতেছে। তাহাদেরই অন্তরের আকুলতা গভীর নিশীথে নৈশ-বিহঙ্গমের করুণ স্বরে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল নাকি?

"ডাক্তারবাবু!"

চমকাইয়া উঠিলাম। সেই ভদ্রলোক আসিয়া হাজির হইয়াছেন, যিনি জরার প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মহাকালের উপর টেক্কা দিয়া বুকে গুলি করিয়াছিলেন।

"দেখুন তো ডাক্তারবাবু, আমার চেহারাটা ঠিক আছে কি না!"

ভদ্রলোক শিস দিতেছেন।

"ঠিক আছে।"

"চুল আর পাকে নি?"

"না।"

ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন।

কালো মেয়েটি আসিয়া হাজির হইল।

"বড় জ্বালা ডাক্তারবাবু, বড় জ্বালা, বড় জ্বালা।" তাহার পা, পেট, বুক দুর্গন্ধ বড় বড় ক্ষতে ভরিয়া উঠিয়াছে। বাম স্তনটা পচিয়া পুঁয গড়াইয়া পড়িতেছে।

"বড় যন্ত্রণা, জ্ব'লে গেল, সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল আমার।"

নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া শুনিতেছি।

"আমার জ্বালা কমিয়ে দিন, আপনার পায়ে পড়ি।"

"এর ওষুধ আমি জানি না।"

"হ্যাঁ, তুমি জান। তুমি এত বড় ডাক্তার, তুমি জান না?"

কি বলিব? একবার ইচ্ছা হইল, গীতার একটা শ্লোক আবৃত্তি করি। হয়তো যদি কোন উপকার—

"ওয়াক, ওয়াক—"

মাতালটা আসিয়া মেয়েটার গায়ে হুড়হুড় করিয়া বমি করিয়া দিল।

"দাদা, একটু জল দাও, একটু জল দাও, উঃ, পায়ে বড় খিল ধরছে।"

ভাই-বোনগুলার হাহাকার এখনও ভাসিয়া আসিতেছে কোথা হইতে? কলেরা-রোগীর আকণ্ঠ-পিপাসা কি এখনও মিটে নাই?

কবন্ধটা মোটা কালো মেয়েটার গলা জড়াইয়া আগাইয়া আসিল। কাটা মুণ্ডটাও শূন্যে দেখা দিল। মুখে বিকট হাসি।

"ঠকিয়েছে! ভারি ঠকিয়েছে! ছেড়ে দে, ওরে, ওটাকে ছেড়ে দে! কালো মোটা কুৎসিত মেয়েটা! নারীমাংস আমার প্রিয় বটে, কিন্তু ওই পেত্নীটাকে নিয়ে থাকতে পারব না। ছেড়ে দে, ছেড়ে—"

কবন্ধটা তৎক্ষণাৎ মেয়েটাকে ছাড়িয়া পিছাইয়া গেল।

মুণ্ডটা হাসিতে লাগিল, হা—হা—হা—হা—।

"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে।"

কবি সেই পোড়া মেয়েটাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহার বিদীর্ণ খুলি হইতে মস্তিষ্কটা বাহির হইয়া মেয়েটার চোখে মুখে লাগিয়া যাইতেছে। কবি তাহাকে কিছুতেই ছাড়িবে না।

ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া সেই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকটা হি-হি করিয়া হাসিতেছে। তাহার সিংহের মত মুখটা হইতে বিষাক্ত লালা ঝরিয়া ঝরিয়া আমার ঘরের মেঝে ভাসিয়া গেল।

"যেমন ক'রে হোক নির্ম্মলকে দেখে নিতে হবে। টা . চাই—"

"ঠিক বলেছ ভাই, টাকা চাই, টাকা চাই, টাকা—টাকা—টাকা—কই—কোথায়—?"

কালো লোকটা লম্বা হাত বাহির করিয়া শূন্যে হাতড়াইতে লাগিল।

সর্পকবলিত ভেকটা তারস্বরে শেষ চীৎকার করিয়া থামিয়া গেল হঠাৎ।

ক্যালেণ্ডারের ছবিখানার সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠ।

শেষ